কার্ত্তিক-চরিত

অর্থাৎ

(শান্তিপুর সুতরাগড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস
মহাশয়ের জীবনী-প্রসঙ্গে উক্ত গ্রাম ও তত্রত্য
মোদকজাতির সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

মনুসংহিতা।

শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চইংরেজি বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক
শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

শান্তিপুর-সুতরাগড়ের চড়কতলা ষ্ট্রীটস্থ ৩২ নং-ভবন হইতে
শ্রীপাঁচুগোপাল ইন্দ্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
ইং ১৯১৫ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

নমো গণেশায়।

"যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি
পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা
তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায়॥"

কবিকঙ্কণকৃত অনুবাদ :—

জয়, বেদান্ত দরশনে, ব্রহ্ম বলি বাখানে,
আরে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি, হেতু অন্তরায়-পতি
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম॥

"চণ্ডী" গ্রন্থের সূচনা।

"স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিং।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে॥"

নীতিশতকম্।

উপক্রমণিকা।

এ পর্য্যন্ত মোদকজাতির ইতিহাস পুস্তকাকারে কেহই প্রকাশিত করেন নাই। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উহা প্রকৃতপক্ষে মোদকজাতির বিবরণ নহে। উহাতে মধুমোদক-গণের বৃত্তান্ত মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন যে, আধুনিক মধুমোদকদিগের পূর্ব্বপুরুষ, শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাবলেই কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মোদকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহার বংশধরেরা আপনাদিগকে 'মোদক' নামে পরিচিত করিতেছেন। প্রকৃত মোদকগণের সহিত অদ্যাবধি ইহাদের কোন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড হয় নাই। প্রকৃত মোদকগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের সমাজের বিভিন্ন শাখা না মনে করিয়া, বরং একটী স্বতন্ত্র জাতিই মনে করিয়া থাকেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃত মোদকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তির 'মোদক' উপাধি দেখা যায় না।

যাহাহউক প্রকৃত মোদকজাতির ইতিবৃত্ত এতাবৎ লিখিত হয় নাই।

'বিশ্বকোষ'াদি অভিধানে মোদকজাতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে কিছুই পরিতৃপ্তি হয় না। শ্রবণ করিয়াছি, মোদকজাতির ইতিহাসসংগ্রহবিষয়ে কেহ কেহ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে যত্নের ফল আমরা অদ্যাবধি ভোগ করিতে পাই নাই। সুতরাং উপযুক্ত উপকরণ অভাবে এই ইতিহাস এক্ষণে যথাযথরূপে সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। বলিতে কি, সমগ্র মোদক-জাতির ইতিহাসের কথা দূরে থাকুক, শান্তিপুর-সূত্রাগড়-নিবাসী

কতিপয় মুষ্টিমেয় মোদক-পরিবারের যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহ করাও অধুনা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, নব্যগণের অযত্ন ও ঔদাস্যই ইহার একমাত্র কারণ। প্রাচীনগণ একে একে সকলেই গত হইতেছেন। যে দুই একজন আছেন তাঁহাদের অবর্ত্তমানে এই ইতিহাস সংগ্রহ করা আরও কঠিন হইয়া উঠিবে। সর্ব্ববিধ্বংসী কালের ধর্ম্মে সকলই লয় প্রাপ্ত হইতেছে ও হইবে। তাই নানাবিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও এই ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা।

কিন্তু এই গ্রন্থ মোদকজাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নহে। যাঁহারা মোদকজাতির ধারাবাহিক ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা নিরাশ হইবেন। এই পুস্তকে আমি শান্তিপুর-সুতরাগড়-নিবাসী মোদকসাধারণের শিক্ষা ও সভ্যতার একটী স্থূল চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সাধারণভাবে জাতির ইতিবৃত্ত না লিখিয়া ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রাঙ্কনে চেষ্টা করিলেই মোদকগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্র অনেকটা পরিস্ফুট হইবে, এই আশায় আমি এই গ্রন্থে শান্তিপুর-সুতরাগড়-নিবাসী মোদকজাতির সুযোগ্য প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনকথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অবান্তরভাবে তাঁহার পিতা ও পিতামহেরও একটী সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। ফলতঃ গ্রন্থখানিকে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের একখানি জীবনী বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই জন্য আমি ইহার "কার্ত্তিকচরিত" নাম দিলাম। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে বিষয়নির্ব্বাচনে আমার ভয়ঙ্কর ভ্রম বা পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটিয়াছে। একথা আমি একবারে অস্বীকার করি না। কারণ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তিনি লোকসমাজে সাধু বা মহাপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত নহেন। তিনি

অসাধারণ বিদ্বান্ বা বিবিধ সাত্বিক দানাদির দ্বারা সুকীর্ত্তিমান্ বলিয়াও প্রসিদ্ধ নহেন। অসামান্য ধীশক্তি বা অলৌকিক শারীরিক সৌন্দর্য্যেও তিনি গণনীয় নহেন। বলবীর্য্য, সাহস পরাক্রম, হৃদয়ের প্রশস্ততা বা নৈতিক মাহাত্ম্যেও তিনি সাধারণ সমক্ষে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য নহেন। তথাপি কার্ত্তিকচন্দ্র এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়ীভূত হইলেন কেন? কার্ত্তিকচন্দ্রকে গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিবার হেতু আছে। পূর্ব্বেই কহিয়াছি, কার্ত্তিকচন্দ্র সুতরাগড়-নিবাসী মোদকগণের সুযোগ্য প্রতিনিধি। প্রতিনিধি এই জন্য যে, ভগবদিচ্ছায় কার্ত্তিকচন্দ্র আজ নদীয়া জেলার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া গণ্য। সাধারণের হিতকর কয়েকটী কার্য্য করিয়া তিনি ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকটও পরিচিত হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে কার্ত্তিকচন্দ্র এখনও স্বদেশ ও স্বজাতির হিতকল্পে বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া এই নশ্বর সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন। বিশেষতঃ কার্ত্তিকচন্দ্র "সুতরাগড় মোদকহিতৈষী সমাজে"র সভাপতি এবং ১৩১৫ সালে এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকালে সমাজ হইতে প্রকাশিত উহার নিয়মাবলী ও উদ্দেশ্যসূচক পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছিল "সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে এই সমিতি হইতে আমরা অচিরে মোদক-সম্প্রদায়ের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস প্রস্তুত ও প্রকাশ করিতে বাসনা করিয়াছি।" অধুনা একমাত্র কার্ত্তিকচন্দ্রের ব্যয়েই সমাজবিষয়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অতএব কার্ত্তিকচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া অত্রত্য মোদকজাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে যত্নপর হওয়া আদৌ অসঙ্গত বা অযৌক্তিক হয় নাই।

এস্থলে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে সুতরাগড়ের মোদকজাতির মধ্যে আরও অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন।

অর্থ সম্বন্ধে তাঁহারা কার্ত্তিকচন্দ্র অপেক্ষা বহু পরিমাণে হীন হইলেও, সাধুতা, উদারতা ও চরিত্রগৌরবে তাঁহারা কার্ত্তিকচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন বা আছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এ সকল মহাত্মারও জীবনী সঙ্কলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আশা করি স্বজাতীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারা কালে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ জীবনী-সঙ্কলন সহজ ও সুসাধ্য হইতে পারে তাহারই জন্য আমি একটী ক্ষীণ ভিত্তিচিহ্ন রাখিয়া যাইতেছি মাত্র। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক যদ্যপি জাতীয় বা ব্যক্তিগত ইতিহাস সঙ্কলনবিষয়ে মোদককুলসম্ভূত কীর্ত্তিমান্ সুযোগ্য ভাবী লেখকগণকে কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য করে তবেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এই অকিঞ্চিৎকর ভিত্তিচিহ্ন অবলম্বন করিয়া উত্তরকালে তাঁহারা ইহার উপর সুদৃশ্য, সুরম্য প্রাসাদাবলী নির্ম্মাণ করুন।

স্বজাতীয় সুধী ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিয়া দেওয়াই বাহুল্য যে, আপন জাতি ও বংশের ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত না থাকিলে কেহ কখনই নিজ জাতির প্রতি মমতাবান্ হইতে পারেন না। সুতরাং নিজ জাতির উন্নতি বিষয়েও তাঁহার যত্ন বা চেষ্টা হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ আপন আপন কুল ও বংশের বিশুদ্ধতা ও গৌরব রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহিত আমাদের কৌলিক কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদিত থাকা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সুতরাং ঈদৃশ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়াই আমি এই ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইতিহাস-সংগ্রহবিষয়ে আমার এই প্রথম উদ্যম। এই উদ্যম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে একথা কখনই বলিতে পারিব না। তবে এতদিনে মোদকজাতির ইতিহাসের একটী ভিত্তি সংস্থাপিত

হইল ইহা মনে করিয়া আমি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট ভক্তি ও আনন্দভরে প্রণত হইতেছি।

উপসংহারে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে পাণ্ডিত্য বা রচনাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা আদৌ করি নাই। তবে প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোভাগে এবং পুস্তকের মধ্যেও কোন কোন স্থলে শাস্ত্রাদি হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহাতে পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নহে। মর্ম্মকথা সংক্ষেপে অথচ পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পুস্তকের অযথা কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি অনেক স্থলেই শ্লোক সমূহের বঙ্গানুবাদ সংযোজিত করিতে পারি নাই। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। তাঁহারা শ্লোকগুলি বাদ দিয়া পাঠ করিলেও পুস্তক বুঝিবার কোন অন্তরায় বা অসুবিধা হইবে না। আরও এক কথা। এই পুস্তক রচনাকালে আমি অনুক্ষণ স্মরণ করিয়াছি যে, ইহার ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক যাহাতে বালক, বৃদ্ধ, বনিতা এবং শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই বিনা আয়াসে উহা বুঝিতে পারেন। এই নিমিত্ত ভাষার সারল্য রক্ষা বিষয়ে আমি অত্যধিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিচার করিবেন।

পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে দেখিলাম, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েক স্থলে বর্ণাশুদ্ধি ও বিষয়ঘটিত কয়েকটী সামান্য সামান্য ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। 'উ'কার স্থলে কোন কোন শব্দে 'ঊ'কার ছাপা হইয়াছে। বিশেষতঃ 'ঈ'কার ও 'ই'কারের প্রয়োগ সম্বন্ধে সমাসের নিয়ম সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হয় নাই। দুই এক স্থলে 'র'এর অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। যথা ২২ পৃষ্ঠায় ১৯ পঙ্‌ক্তিতে 'সুতরাগড়ে' না হইয়া 'সুতরাগড়ের' এবং ৮৬ পৃষ্ঠায় ১৮ পঙ্‌ক্তিতে 'বাহিরে' না হইয়া

'বাহিরের' ছাপা হইয়াছে। কোথাও 'র'এর লোপ এবং কোথাও 'র'এর স্থানে 'ব' বা 'য়' ছাপা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৮ পৃষ্ঠায় 'ভোগারাদির' স্থলে 'ভোগরাগাদি' পাঠ করিতে হইবে। ১০ পৃষ্ঠায় "শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার" না হইয়া "বসন্তকুমার" হইবে। ১১ পৃষ্ঠায় "শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের" স্থলে "উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের" পাঠ করিতে হইবে। ১৩ পৃষ্ঠায় 'অল্পই দৃষ্ট হয়' স্থলে 'অল্পই দৃষ্ট হন,' এবং ২৩ পৃষ্ঠায় 'সাঁতরাগাছি'র স্থলে 'সুতরগাছি' পাঠ করিতে হইবে। ৩০ পৃষ্ঠায় 'উপসর্গ'র স্থলে 'উৎসর্গ' পাঠ করিতে হইবে। ৩২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে—"গণেশচন্দ্র দাসের দুই প্রপৌত্র রাম-নারায়ণ দাস ও শিবরাম দাসের সন্তান সন্ততিই শান্তিপুর সুতরাগড়ের মোদক 'দাস' বংশ বলিয়া পরিচিত। কার্ত্তিকচন্দ্র শিবরাম দাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ৺ মাণিকচন্দ্র দাসের পুত্র।" ৫৯ পৃষ্ঠায় 'দুর্ণাম' স্থলে 'দুর্নাম' এবং "বিদ্বজ্জনসমাজ" স্থলে "বিদ্বজ্জন-সমাজে" হইবে। ৬১ পৃষ্ঠায় একই ব্যক্তির সম্বন্ধে 'রোগী' ও 'রোগিণী' উভয় শব্দই ছাপা হইয়াছে। সর্ব্বত্র 'রোগিণী' পাঠ করিতে হইবে। ৬২ পৃষ্ঠায় 'তচ্ছবণে' না মইয়া 'তচ্ছ্রবণে' হইবে। ৮০ পৃষ্ঠায় 'এই এই' না হইয়া 'এই' এবং ৮৪ পৃষ্ঠায় 'ডলি'র স্থলে 'ডুলি' হইবে। ৮৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে "মোদকগণের বংশ পরিচয়" না হইয়া "মোদকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" হইবে। ৮৯ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত শ্লোকে 'কায়নোত্তয়া' স্থলে 'কায়নোত্থয়া' হইবে। ৯৪ পৃষ্ঠায় "সাধক-সঙ্গীত" স্থলে "সাধন-সঙ্গীত" পাঠ করিতে হইবে। ৯৫ পৃষ্ঠা হইতে ১১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পুস্তকের শিরোভাগে 'মনোশিক্ষা ও প্রার্থনা-মালা' স্থলে সর্ব্বত্র "মনঃশিক্ষা ও প্রার্থনা-মালা" পাঠ করিতে হইবে। ৯৭ পৃষ্ঠায় "মনোসুখে" না হইয়া "মনঃসুখে" হইবে। সর্ব্বশেষে ১১২ পৃষ্ঠায় "ভবভয়হারা" এবং "কালীপদে"র স্থলে "ভবভয়হরা" ও "কালীপদ" পাঠ

করিতে হইবে। এই পুস্তকের যদি কখন পুনর্মুদ্রাঙ্কন হয় তবেই এই সকল ও অন্যান্য ভ্রমের সংশোধন হইবে আশা করা যায়। অধুনা সুধী পাঠক নিজগুণে সঙ্কলয়িতার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে আমি অনেকের নিকটই অল্পবিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ সুতরাগড়ের প্রাচীন তথ্য সম্বন্ধে আমি শ্রীযুক্ত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী সাহা, এল, এম, এস, মহোদয়ের এবং আমার পূজ্যপাদ মাতুল শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ের নিকট অনেক সাহায্যলাভ করিয়াছি। 'সুতরাগড়' গ্রাম এককালে সেওরাফুলীর রাজাদিগের অধিকৃত ছিল এই প্রাচীন তথ্য এবং 'গোড়াই মণ্ডল' সম্বন্ধীয় রহস্যজনক কথা আমি আমার প্রাগুক্ত মাতুল মহাশয়ের প্রমুখাৎই শ্রবণ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কোন গ্রহবিপ্রের গৃহে রক্ষিত একখানি প্রাচীন কাগজে (দরখাস্তে) লিখিত আছে—"১১৯৮ সালে স্বর্গীয় মহারাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় বাহাদুর নিলামে এই সুতরাগড় মহল খরিদ করিয়াছিলেন।" অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে যত্নপর হইবেন। আর একখানি দানপত্রে নিম্নলিখিত কয়েকজন ভূস্বামীর নাম পাওয়া গেল :—শ্রীগোবিন্দ দেব রায়। শ্রীগঙ্গাধর রায়। শ্রীমুকুন্দদেব রায়। শ্রীমনোহর রায়। শ্রীরামশঙ্কর রায়। শুনা যায় ইঁহারা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত 'পাটুলী'র ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইঁহারা স্থানীয় কোন বিপ্রকে হরিনদীর অন্তর্গত সুতরাগড়ের কিঞ্চিৎ ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপে দান করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থোক্ত 'আস', 'দাস', 'নন্দী' প্রভৃতি উপাধির উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রবাদ আমার পূজ্যপাদ পিতৃব্য অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাস মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। 'দাস' বংশীয়-

দিগের বংশতালিকা আমার পরলোকগত পূজনীয় মধ্যম পিতৃব্য কেদারনাথ দাস মহাশয়ের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

সুতরাগড় 'মিড্ল্ স্কুলের' প্রতিষ্ঠাতৃগণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা আমার পঞ্চদশবর্ষে লিখিত 'ডায়েরি' হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

উল্লিখিত গুরুজনসকল এবং অন্যান্য যে সমস্ত সমবয়স্ক বা বয়ঃকনিষ্ঠ সুহৃদ্ এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে বা অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য আমাকে সাহায্য বা সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিমধিকমিতি।

পরিশেষে বক্তব্য এই সংস্করণের সমস্ত পুস্তকই বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। সুতরাং পুস্তকের কোন মূল্য নির্দ্ধারিত হইল না।

সঙ্কলয়িতা।

সন ১৩২২, ৪টা ভাদ্র।

বিষয়ানুবন্ধ।

চিত্রসূচী।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস

কার্ত্তিক-চরিত

প্রথম অধ্যায়।

জন্মস্থান পরিচয়।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাজিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥"

—মনুসংহিতা।

"বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সুতরাগড় গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুর সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ পল্লী। শান্তিপুর এরূপ প্রাচীন ও সুবিস্তীর্ণ নগর যে সংক্ষেপে ইহার বিবরণ লিখিবার চেষ্টা করা বৃথা। এই নগর সহস্র বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আদিগুরু

শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় যৎকালে শান্তিপুরে অধ্যয়নাদি করিতেন তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে শান্তিপুর পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। কেহ কেহ বলেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাস্ত্রাধ্যাপক 'শান্ত' মুনির নামানুসারেই শান্তিপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এ অনুমান সঙ্গত মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ের সার্দ্ধপঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বেও শান্তিপুর একটী বহু জনাকীর্ণ প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। সুতরাং শান্তমুনির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শান্তিপুর নাম প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবকাল কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধচারিশত বৎসর হইবে। শুনা যায়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রপিতামহ শ্রীনরসিংহ মিশ্র শান্তিপুরে আগমন করেন। শান্তিপুব ভাগীরথীর পুণ্যময় তটে অবস্থিত এবং নানাবিধ সুখসেব্য দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ একটী শান্তিময় স্থান ছিল বলিয়াই বোধ হয় শান্তিপুর নামেব সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

এই নগর বহুপল্লীতে বিভক্ত। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় সপ্তবিংশতি সহস্র। তন্মধ্যে প্রভুসন্তান গোস্বামিগণ এবং তন্তুবায় জাতীয়গণের সংখ্যাই অত্যধিক। এক সময়ে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীউদয়নাচার্য্য, শ্রীকৃপাচার্য্য এবং শ্রীপুষ্করাচার্য্য নামে পঞ্চজন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপ্রবর বসতি করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কিছুকাল পরে শ্রীমাধবাচার্য্য নামে অপর এক মহাত্মাও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত আচার্য্য মহোদয়গণের বংশধরেরা অদ্যাপি শান্তিপুরে বাস করিতেছেন।

শান্তিপুরের প্রাচীন পরিবারগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতীয় রায় পরিবার ও চট্টোপাধ্যায় পরিবার, তন্তুবায় জাতীয় খাঁ পরিবার এবং তিলি জাতীয় প্রামাণিক পরিবার সমধিক প্রসিদ্ধ। বহুদিবস হইতে রায় পরিবারের বাবুরা শান্তিপুরের জমিদার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই পরিবারের

৺ উমেশচন্দ্র রায় বা মতিবাবুর নাম বঙ্গদেশের অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় মহাশয় অধুনা শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেক সংকীর্ত্তির কথা শুনা যায়। স্বনামখ্যাত সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয় রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধুনা এই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সুযোগ্য বংশধর বলিয়া গণ্য। খাঁ পরিবারের পুণ্যবান মহাত্মারা শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ জিউ ও শ্রীশ্রীকালাচাঁদ জিউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার নানাস্থানে ১০৮টী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। প্রসিদ্ধ প্রামাণিক পরিবারের অন্যতম শাখার পরলোকগত হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয় একজন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। অনেক সুবিখ্যাত সাধক ও মহাপণ্ডিত শান্তিপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাপণ্ডিতগণের মধ্যে স্বর্গীয় রাধামোহন গোস্বামী বা "গোস্বামী ভট্টাচার্য্য" মহাশয়ের নাম বঙ্গদেশের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্বে শান্তিপুরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত একটী রেশমের কুঠী ছিল। গবর্ণর জেনারেল মার্ক্‌ইস অব্‌ ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর এই কুঠীতে আসিয়া কয়েক দিবস বাস করিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর নদীয়া জেলার একটী সব্‌ডিবিজন বা মহকুমা ছিল। এই শান্তিপুর নগরের পশ্চিম প্রান্তস্থ সুবৃহৎ পল্লীর নামই সুতরাগড়। এই গ্রামকে অনেকে ভ্রমক্রমে 'সূত্রগড়' বলিয়া থাকেন। অনেক কাগজপত্রেও 'সূত্রগড়' নাম লেখা হইতেছে। কিন্তু গ্রামের প্রকৃত নাম 'সুথর গড়' বা সুতরাগড়। ইহা অবশ্য যাবনিক শব্দ। 'সুতরাগড়' শব্দের ঠিক অর্থ জানি না। শুনিয়াছি 'সুতরাগড়' বা 'সুথরগড়' অর্থে সুন্দর গড়।

সুতরাগড়কে কেন গড় বা কেল্লা বলা হয় তাহার কারণ আছে। শান্তিপুরের পূর্ব্বভাগে অদ্যাপি 'সারাগড়' নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন এই সারাগড়ই পূর্ব্বে সুরুগড় নামে অভিহিত হইত। তাহা হইলে অনুমান করা যায় যে পূর্ব্বকালে 'সুতরাগড়' হইতে বর্ত্তমান 'সারাগড়' পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত গড় বা কেল্লা ছিল। এই গড় বা কেল্লা অবশ্য মুসলমান বাদসাহগণের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই গড় বা কেল্লা কোন্ বাদশাহের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে তাহা যথার্থরূপে নির্ণয় করা দুরূহ। শুনা যায়, হুমায়ুন বাদসাহের সঙ্গে পারস্যদেশ হইতে একজন সাধক মুসলমান আগমন করিয়াছিলেন। হুমায়ুন তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। সাধক কিছুকাল দিল্লী নগরীতে বাস করিয়া দেখিলেন যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক গোলযোগে ঐ মহানগরী সর্ব্বদা অশান্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি হুমায়ুনের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ আকবর বাদসাহের নিকট ভজনসাধন জন্য একটী শান্তিময় নির্জ্জন স্থান প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে বাদশাহ উত্তর করিলেন—"বাঙ্গলা দেশে সুতরাগড় ও চাঁদকুরি নামে আমার অধিকৃত দুইটী স্থান আছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত স্থানে আমার একটী কেল্লা আছে। ঐ কেল্লা রক্ষার্থ আমি ১৩০০ পাঠান ও ৯০০ রজঃপুত সৈন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছি। সৈন্যগণ যাহাতে সুতরাগড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে তাহারও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। আপনি সুতরাগড়ে গমন করিয়া আমার সৈন্যগণের কল্যাণার্থ খোদাকে চেরাক্ (প্রদীপ) প্রদান করুন। ঐ স্থান সুরম্য ও শান্তিপূর্ণ।" এতদনুসারে সাধক সুতরাগড়ে আসিয়া বাস করেন। আকবরকথিত চাঁদকুরি অদ্যাপি বর্ত্তমান। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত।

এরূপও শুনা যায় যে আকবর বাদসাহের আদেশানুসারে বাঙ্গালার

নবাব মুজাফর খাঁ, সাহা আলম নামক কোন পীর বা মুসলমান ফকীরকে সুতরাগড় গ্রাম জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। সুতরাগড়ে খুন্দকার (মুসলমান পুরোহিত) বাটীতে কাজেম আলি খুন্দকারের নামে আকবর বাদসাহের প্রদত্ত এক পাঞ্জা আছে। তাহাতে লিখিত আছে,—দক্ষিণে গঙ্গানদী, উত্তরে নির্ঝর ও বাবলাগ্রাম, পূর্ব্বে সুরুগড় ও পশ্চিমে গোফেয়া এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থান তোমাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইল।* ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকথিত সাহ আলম নামক ফকীরই কাজেম আলি। শুনা গিয়াছে, এই কাজেম আলি অত্যন্ত তপঃপ্রভাবান্বিত ও দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। সেই কারণেই, তিনি বোধ হয়, পীরনামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। সুতরাগড়ে অদ্যাপি 'পীরের হাট' ও 'ফকীরপাড়া' নামে দুইটী পাড়া, এবং গ্রামের পূর্ব্বভাগে 'তোপখানা', 'পাঠানপাড়া' ও 'রজঃপূত'পাড়া নামে আর তিনটী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠান ও রজঃপূত সৈন্যগণের বংশধরেরা অদ্যাপি সুতরাগড়ে বাস করিতেছেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত লাখরাজ জমি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

খুন্দকারগণের মধ্যে পঞ্চু খুন্দকারের নাম সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে একটী আলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এক দিবস প্রাতে পঞ্চু কোন ভগ্ন প্রাচীরের উপর উপবিষ্ট হইয়া দন্তধাবন করিতেছিলেন। সেই সময়ে অপর কোন মহাপুরুষ ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহা দেখিয়া পঞ্চু প্রাচীরকে আদেশ করিলেন—"চল্ বেটা চল্"। মহাপুরুষের আজ্ঞামাত্র প্রাচীর অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সমস্ত অলৌকিক

---

* এই বৃত্তান্ত স্থানীয় মাসিক পত্র ১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যক 'যুবক' হইতে গৃহীত হইল।

ব্যাপার তপস্যা বা যোগবলে সাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক ভক্তপ্রবর ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারি প্রণীত "শ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" নামক নবপ্রকাশিত সুন্দর গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। সুতরাগড়ের দক্ষিণ পাড়ার এক স্থানে অদ্যাপি পঞ্চু খুন্দকারের সমাধিস্থান বা কবর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুতরাগড়ের প্রাচীন মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাজী পরিবারের এরাজ মুন্সী নামে এক ব্যক্তি আরবি ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কিছু দিবস হইল তিনি টিপুসুলতানের সন্তানগণেব গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন।

সুতরাগড়ের প্রাচীন ইতিবৃত্ত যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধ হয় এই গ্রাম অন্ততঃ তিন শত বৎসরের প্রাচীন। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রাম শান্তিপুরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে ইহা হরিনদী গ্রামভুক্ত হইয়া পড়ে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে 'হরিনদী' একটী সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এই 'হরিনদী' গ্রামের উল্লেখ আছে। ভাগীরথীর ভাঙ্গনে যখন হরিনদী ধ্বংস হইতে লাগিল তখন বহুসংখ্যক কর্ম্মকার, কাংস্যবণিক প্রভৃতি জাতি হরিনদী ত্যাগ করিয়া শান্তিপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতি করেন। অদ্যাপি হরিনদী নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রাম সুতরাগড়ের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত।

সুতরাগড় যখন হরিনদীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে তখন নাকি সেওড়াফুলীর রাজারা উহার ভূম্যধিকারী ছিলেন। কিরূপে উহা নবদ্বীপাধিপতির অধীন হইয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় না। এ সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য নির্ণয়

করা কঠিন। শুনা যায় সুতরাগড় গ্রামের ভূস্বামিত্ব লইয়া এক সময়ে সেওড়াফুলীর রাজার সহিত নবদ্বীপাধিপতির বিবাদ বিসংবাদ চলিতেছিল। সরল ও সত্যবাদী বোধে গোঁড়াই মণ্ডল নামক গোপ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে উভয় পক্ষের কর্ম্মচারীই সাক্ষী মানেন। সুতরাগড়ের একটী প্রাচীন শিবমন্দির এই গোঁড়াই মণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। এই গোঁড়াই মণ্ডল নদীয়া মহারাজের পক্ষ সমর্থন উদ্দেশে একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। সে তাহার পাদুকার মধ্যে সুতরাগড়ের কিছু মৃত্তিকা লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। সাক্ষ্য লইবার জন্য তাহাকে সুতরাগড়ের সীমার বহির্ভূত কোন স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। সে স্থানটী প্রকৃতপক্ষে সেওড়াফুলীর রাজাদিগের অধিকৃত ছিল। গোঁড়াই মণ্ডল কতদূর সত্যবাদী জানিবার জন্য পূর্ব্বকথিত রাজাদিগের কোন কর্ম্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"আচ্ছা, গোঁড়াই তুমি বল, এখন কোন্ মাটীতে দাড়াইয়া আছ।" গোঁড়াই অম্লানবদনে কহিল—"মহাশয়, আমি গড়ের মাটীতে দাঁড়াইয়া আছি।" বস্তুতঃ তাহার পাদুকামধ্যে পদতলে গড়ের মৃত্তিকাই ছিল। শুনা যায়, এই ঘটনার কিছুকাল পরে নবদ্বীপাধিপতির কোন নবকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া সেওড়াফুলীর রাজা সুতরাগড় গ্রাম নদীয়া-মহারাজকে যৌতুক বা উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

সুতরাগড়ের বর্ত্তমান রাজবাটী শান্তিপুরের বড়গোস্বামি মহাশয়-গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। শুনা যায়, এখানে কোন সাধু মহা-পুরুষ বাস করিতেন। বাটী নির্ম্মিত হইলে গোস্বামি মহাশয়েরা এখানে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধি সেবাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐ ষড়ভুজ মূর্ত্তি অদ্যাপি বড়গোস্বামী মহাশয়-দিগের দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধারমণজিউর মূর্ত্তির সহিত পরিরক্ষিত

হইতেছেন। ষড়ভুজের নামানুসারে অদ্যাপি সুতরাগড়ের একটী পাড়াকে ষড়ভুজের পাড়া বলা হইয়া থাকে। কিরূপে এই রাজবাটী নবদ্বীপাধিপতির হস্তগত হইয়াছে জানা যায় না। প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইল বর্ত্তমান রাজবাটীতে নদীয়া-মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এক সুন্দর গোপালমূর্ত্তি ছিলেন। ঐ গোপালের সেবার জন্য পূজারি ব্রাহ্মণ ও ভোগারাগাদির ব্যবস্থা ছিল। পরে ঐ গোপাল মূর্ত্তি নদীয়া-রাজবাটীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

সুতরাগড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য মন্দ নহে। দক্ষিণে প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী প্রবহমানা, পূর্ব্বে সুসমৃদ্ধ শান্তিপুর, উত্তরে রঘুনাথপুর, হরিপুর, কুলিয়া, করঞ্চপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রাম এবং পশ্চিমে হরিপুরের খাল। দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ চরের মধ্যে তিনটী সুগভীর দেবখাত হ্রদ বা দহ। গ্রামের মধ্যে কয়েকটী পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে গ্রামের দক্ষিণভাগস্থ 'সাহাদের পুষ্করিণী' অত্যন্ত প্রাচীন। এই পুষ্করিণীর নিকট বহু প্রাচীন একটী মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন শান্তিপুরে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন ইষ্টকালয় আর নাই। ভক্তপ্রবর সুপ্রসিদ্ধ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয় শান্তিপুরে শুভাগমন করিলে কখন কখন এই মসজিদ দর্শন করিতে যাইতেন। বোধ হয় সেকালে অনেক মুসলমান সাধক এই মসজিদে ভগবদুপাসনা করিতেন। যে ভাগ্যবান মুসলমান এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন শুনা যায় পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণী তাঁহারই ছিল। কালক্রমে উহা সুতরাগড়ের সাহাগণের হস্তগত হয়। ১২৬৬ সালে ৺গঙ্গাগোবিন্দ সাহা উক্ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করেন। এই পুষ্করিণী ভাগীরথীর সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া বন্যার সময় উহাতে ভাগীরথীর পূতবারি প্রবেশ করিয়া থাকে। অপর কয়েকটী পুষ্করিণীর মধ্যে 'পালের পুষ্করিণী' ও 'সরিবৎ সেখের পুষ্করিণী' সর্ব্বাধিক প্রাচীন। প্রথমোক্ত

পুষ্করিণীটী পূর্ব্বে একটী দীর্ঘিকা ছিল। গ্রামের স্বাস্থ্য পূর্ব্বে খুব ভাল ছিল। অধুনা কোন কোন বৎসর ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ দৃষ্ট হয়।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে সুতরাগড়ের দক্ষিণ অংশেই লোকের বসতি ছিল। এখন যে অংশকে ময়রাপাড়া ও উত্তরসড়ক বলে সে অংশ তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গ্রামের মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাসের বাটীর নিকট এক ঘর দুলিয়ার বসতি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় ঐ দুলিয়ার গৃহই এককালে সুতরাগড়ের উত্তর সীমা ছিল। বস্তুতঃ বাগ্দী, দুলিয়া, ডোম প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিগণ গ্রামের প্রান্তভাগেই সচরাচর বাস করিয়া থাকে।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সুতরাগড়ের মধ্যভাগ হইতে হরিপুর বা রঘুনাথপুর গ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র ভুভাগ একটী অখণ্ড অরণ্য ছিল। সুতরাগড় হইতে রঘুনাথপুর যাইতে লোকে ভয়ে ভয়ে সেই অরণ্য অতিক্রম করিত।

সুতরাগড়ের অধিকাংশ মোদকগণই পূর্ব্বে গ্রামের দক্ষিণ অংশে বাস করিতেন। গঙ্গাদেবীর ভাঙ্গনে যখন ঐ দক্ষিণ অংশ নষ্ট হইতে লাগিল তখন অনেকেই উত্তর দিকে সরিয়া আসিলেন। বিশেষতঃ ১২৩০ সালের বিষম বন্যার পরে কেহই আর দক্ষিণ অংশে বাস করা নিরাপদ মনে করেন নাই। এইরূপে ময়রাপাড়া ও উত্তর সড়কের সৃষ্টি হইয়াছে।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সুতরাগড়ে যে সমস্ত সম্পন্ন পরিবার ছিলেন তন্মধ্যে 'সাহা' পরিবার এবং তাম্বুল জাতীয় 'দে' পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহা পরিবার অতি বিস্তৃত ছিল। এই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণ হিন্দুর অনুষ্ঠেয় অনেক ক্রিয়াকাণ্ড সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। কাপড়ের ব্যবসায় দ্বারাই সাহাগণ সমৃদ্ধ হইয়া

উঠেন। সাহাপরিবারের উপযুক্ত বংশধর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহা এল, এম, এস' অদ্যাপি জন্মস্থানে বাস করিয়া বিনা দর্শনীতে (Fee) চিকিৎসা এবং অনেক স্থলে বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদান করিয়া জনসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। কুঞ্জবাবু ইংরেজি ১৮৭০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইনি 'কবিতাকুসুম মালিকা' নামে একখানি কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। ঐ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ৺বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গদর্শন' এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় অনুকূলভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। বহু দিবস হইতে কুঞ্জবাবু শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচিত কমিশনর এবং শান্তিপুর বেঞ্চের অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিতেছেন।

তাম্বুলি জাতীয় 'দে' পরিবারের ব্যক্তিগণও অনেক সৎক্রিয়া করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ "বড় তাম্বুলি" নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই পরিবারের ৺ক্ষেত্রমোহন দের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺প্রসন্নকুমার দে কিছু দিবস হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার দে ও সম্প্রতি গতাসু হইয়াছেন।

পূর্ব্বে সুতরাগড়ে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণও বাস করিতেন। ৺বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা ৺রামচাঁদ চূড়ামণি মহাশয় অধ্যাপনার জন্য চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করিতেন। এই বংশের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য গত বৎসর বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাগড় নিবাসী ইংরেজি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানগণের মধ্যে ৺প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সুতরাগড় নিবাসী গোপব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিত ছিলেন শুনা যায়। কেহ কেহ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত সমান মর্য্যাদা ও সম্মান লাভ করিতেন। এই শ্রেণীস্থ শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় শ্রেণীর সামাজিক উন্নতির জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া অযথা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহার উদ্যম কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। ইনি এবং ইঁহার প্রধান সহকারী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায মহাশয়ের চেষ্টায় সুতরাগড়ের "বল্লবসমিতি" হইতে গোপজাতি সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক দুইখানির নাম—'গোপতত্ত্বকৌমুদী' ও 'নন্দগোপের বংশ কোন্ গোপ?' প্রথমোক্ত পুস্তকে গোপজাতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় শাস্ত্রসঙ্গত সুযুক্তির সহিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সেতার ও মৃদঙ্গবাদনে সুপটু। বিপিন-চন্দ্র ব্যাকরণ ও স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ হইতে 'স্মৃতিভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুতরাগড়ের ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাঁহারা কবির গান ও কীর্ত্তনাদির রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণপাড়া নিবাসী ৺মধুসূদন ভট্টাচার্য্য এবং আচার্য্যপাড়া নিবাসী ৺বিষ্ণুচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাগড়ের কীর্ত্তন গায়ক তন্তুবায় জাতীয় বিপ্রদাস সেন মহাশয়ের কিছুদিবস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে।

সুতরাগড় নিবাসী সাধক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে তাম্বুলি পাড়া নিবাসী ৺রামেশ্বর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের নাম অনেকেই অবগত আছেন।

অধুনা সুতরাগড়ে প্রায় ৪০ ঘর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাস। তন্মধ্যে ১০ ঘর রাঢ়ী ও ৩০ ঘর বারেন্দ্র। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদেশাগত কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ সুতরাগড়ে নূতন বসতি

করিয়াছেন। তন্মধ্যে সূত্রধরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, লঙ্কাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাম্বুলিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত ভবতারণ চক্রবর্ত্তী এবং আচার্য্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন ভৌমিক মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে সুতরাগড়ে যে কয়েক ঘর কায়স্থ পরিবার ছিলেন তন্মধ্যে সিংহ, মল্লিক, সরকার ও বিশ্বাস বংশীয়েরাই প্রধান। পরে যশোহর জেলা হইতে ৺ভগবানচন্দ্র মুন্সী মহাশয় আসিয়া সুতরাগড়ে বাস করেন। ইঁহারই সুযোগ্য ও কৃতী পুত্র ৺রামগোপাল মুন্সী মহাশয়ের অধিষ্ঠান হেতু সুতরাগড় গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। রামগোপাল বাবুর সুশিক্ষিত পুত্রগণের নিকট ভবিষ্যতে গ্রামের অনেক ভরসা আছে। রামগোপাল বাবুর প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুন্সী ইংরেজি ১৮৯৯সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কয়েক বৎসর হইতে ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর পদে নিযুক্ত আছেন। রামগোপাল বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রতীশচন্দ্র মুন্সী, প্লীডারসিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাণাঘাটে ওকালতি করিতেছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুন্সী, বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। রামগোপাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দমেলা' অদ্যাপি প্রতিবৎসর শীতঋতুতে বসিয়া থাকে। গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত রামগোপাল বাবুর পুষ্করিণী সম্বলিত উদ্যান বাটিকাই এই মেলার স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক রামগোপাল বাবুর নিকট-সম্বন্ধীয় আত্মীয় ৺যামিনীকান্ত মিত্র মহাশয় কিছু দিবস পূর্ব্বে দেহত্যাগ

করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার আয় প্রভূত পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি ঐ আয়ের অনেকাংশ অকাতরে সৎকার্য্যে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণের জন্য সুতরাগড়ে সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। যামিনী বাবুর পুত্রগণ গ্রামে বাস করিয়া উহার শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবেন এরূপ আশা সকলেই করেন।

মল্লিক পরিবারের মধ্যে ৺পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। তিনি শেষ বয়সে কেশব বাবুর প্রচারিত 'নববিধান' নামীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যেরূপ বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অধুনা বিরল। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসী ও ভগদ্‌ভক্ত সংসারীদিগের মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হয়। পরমেশ্বর বাবুর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র জনহিতব্রতধারী পরম ধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক মহাশয়ের নাম অনেকেই অবগত আছেন। পরমেশ্বর বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ মল্লিকও জ্যেষ্ঠের পদাঙ্কানুসরণে চেষ্টা করিতেছেন। পরমেশ্বর বাবুর জীবদ্দশাতেই 'পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা' নামে একখানি পুস্তক রচিত হয়। এই পুস্তকে তাঁহার আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। এই পুস্তক প্রকাশের কিছু দিবস পরে উহার ইংরেজি অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছিল। পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের সহোদর পরলোক গত কাশীশ্বর মল্লিক মহাশয় এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলেন।

কাশী বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট অফিসে চাকুরী করিতেছেন।

সরকার পরিবারস্থ কায়স্থগণের মধ্যে ৺মদনচন্দ্র সরকারের দৌহিত্র ৺রসিকলাল দত্ত নর্ম্ম্যালের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা ও মোক্তারী

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺লুটবিহারী দত্ত মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন।

সুতরাগড়ের বিশ্বাস বংশীয় কায়স্থ পরিবারের দৌহিত্র সন্তান শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বংশের দৌহিত্র সন্তান শ্রীযুক্ত নীলমণি মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন মিত্র, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা করিতেছেন।

সিংহ বংশীয় কায়স্থগণ বরাবর দক্ষিণপাড়ায় বাস করিয়া আসিতেছেন। সুতরাগড়ের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বপ্রথম চাকুরি আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ জাতীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র কর মহাশয় কিছু দিবস শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

তন্তুবায় জাতীয় রায় বামাচরণ প্রামাণিক বাহাদুর মহাশয় নিজগুণে ও কৃতিত্বে রাজপুরুষগণের নিকট যে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া সুতরাগড়বাসিগণ চিরদিন আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। বামাচরণ বাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ প্রামাণিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বামাচরণ বাবুর বংশে তাঁহার ন্যায় স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ পুনরায় দেখিবার জন্য সকলেই সমুৎসুক।

পূর্ব্বে সুতরাগড়ের গন্ধবণিক জাতীয় অনেকের অবস্থা ভাল ছিল। অনেক ঘর গন্ধবণিক অদ্যাপি এখানে বাস করিতেছেন। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা সুতরাগড়ে ভগবান রামচন্দ্রের দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সঙ্গে একখানি রথও নির্ম্মিত হয়। রথ-পর্ব্বোপলক্ষে অদ্যাবধি রঘুনাথ দেবকে

রথে স্থাপন করিয়া যথারীতি রথ টানা হইয়া থাকে। কিন্তু গন্ধবণিকগণের মধ্যে দারিদ্র্য ও গৃহবিচ্ছেদ হেতু এখন আর দেবোদ্দেশে প্রায় কোন উৎসবই দেখা যায় না।

গন্ধবণিক জাতীয়গণের মধ্যে অধুনা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা করিতেছেন। এই জাতীয় শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন দত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কণ্ট্রাক্টরী করিতেছেন।

দৈহিক বল, সাহস ও বীরত্ব জন্য সুতরাগড়ের গোপজাতীয়গণ চিরদিন প্রসিদ্ধ। "গড়ো-গোয়ালা" একটী প্রবাদবাক্য মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যদিও কাহারও কাহারও মতে "গড়ো-গোয়ালা" বলিতে উড়িষ্যাদেশবাসী গোপ-সম্প্রদায় বিশেষকে বুঝায় তথাপি সুতরাগড়ের গোপ জাতীয়গণও যে বিক্রম ও সাহসে প্রসিদ্ধ তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। "গড়ো-গোয়ালা" দিগের বিক্রম বলে সেকালে সুতরাগড়ের লোকেরা ডাকাইতদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। গোপ জাতীয়গণের মধ্যে 'লঙ্কা' 'টেঙরী' ও 'বক্তার' উপাধিধারী গোপেরা সেকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'লঙ্কা' দিগের একটী পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই পুষ্করিণী পূর্ব্বে মিঠুসেথ নামক কোন মুসলমান খনন করাইয়া ছিলেন। 'টেঙরী' বংশের কোন ব্যক্তি বর্দ্ধমান রাজসরকারে ভৃত্য ছিলেন। তিনি নাকি সুবিখ্যাত প্রতাপচন্দ্রকে লালন-পালন করিয়া ছিলেন। "জাল প্রতাপচাঁদের" কৌতূহলজনক ইতিহাস সকলেই অবগত আছেন। 'বক্তার' বংশের ৺দীননাথ ঘোষের সহোদর ৺প্রসন্নকুমার ঘোষের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন সুসভ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। কিছু দিবস ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর একজন কমিশনর ছিলেন।

গোপজাতীয় বহু ব্যক্তির বাস হেতু পূর্ব্বে সুতরাগড়ে বহুল পরিমাণে ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, মাখন প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যাইত। অদ্যাপি "গড়ো ঘী" বলিতে একটী অত্যুৎকৃষ্ট উপাদেয় সামগ্রী বুঝায়। বোধ হয় বঙ্গদেশেব অপর কোন স্থানেই এরূপ বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত মিলে না। কিন্তু কালধর্ম্মে সে দেবভোগ্য ঘৃত অধুনা প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি সকলই দুর্ম্মূল্য। সুতরাং সুতবাগড়ের অধিবাসীদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ সুখ নাই।

সুতরাগড়ে দেশীয় বিশুদ্ধ চিনি অদ্যাপি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুতরাগড় বিশুদ্ধ চিনি ও বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের জন্যই প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন "শান্তিপুরে কাপড়" নামে সে সূক্ষ্ম বস্ত্র নানাস্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহারও কিছু কিছু সুতরাগড় ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে প্রস্তুত হয়।

পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে শিক্ষার অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় কয়েকটী পাঠশালা মাত্র দেখা যাইত। তৎপরে ইংরেজি ১৮৭০ সালে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার অব্যবহিত পরেই ৺বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর দালানে একটী বাঙ্গলা স্কুলের সূচনা হয়। শান্তিপুর নিবাসী ৺ষষ্ঠীচরণ ভট্টাচার্য্য এই বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকমাস মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ হয়। যাহা হউক ইহাকেই সুতরাগড়ের প্রথম বিদ্যালয় বলিতে হইবে।

এই বিদ্যালয় লুপ্ত হইলে ইংরেজি ১৮৭২ সালের ১লাই নভেম্বর সুতরাগড় গ্রামে একটী মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। পরলোকগত বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান উদ্যোগী। ষড়ভুজের বাজারে

৺আশুতোষ ইন্দ্রের যে গৃহ আছে, ঐ গৃহেই প্রথম বিদ্যালয় বসিয়াছিল। ঐ গৃহ তৎকালে ৺সর্ব্বেশ্বর দত্ত নামক গন্ধবণিক জাতীয় কোন ব্যক্তির অধিকৃত ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন কয়েকমাস, এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে তিনি এই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া রঙ্গপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক হইয়া যান। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পরলোকগত গোপীচরণ নন্দী মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই মহাত্মা বহুবর্ষ ধরিয়া যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন সুতরাগড়ের অধিবাসিগণ তাহা চিরদিন কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ রাখিবেন। বস্তুতঃ স্বর্গগত গোপীবাবুর ন্যায় সদাশয় ও সহৃদয় ব্যক্তি অদ্যকার পৃথিবীতে অল্পই দৃষ্ট হন। তাঁহার গুণাবলী সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। ভরসা করি তাঁহার সুশীল সন্তানদিগের দ্বারা কালে সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

সুতরাগড় বিদ্যালয় যৎকালে মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণ করিবার উপযুক্ত হইল তৎকালে উহার প্রধান শিক্ষক উলা নিবাসী ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ইঁহার সময়ে ইংরেজি ১৮৭৭ সালে দুইটী ছাত্র মধ্য-ইংরেজি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালবিহারী মুস্তফী। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমটী উত্তীর্ণ হন। অবিনাশ বাবু পরে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করেন। অধুনা তিনি বরিশালে জজের সেরেস্তাদার। লালবিহারী বাবু শ্রীপুরের প্রসিদ্ধ মুস্তফী বংশীয়। ইনি পরে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তৎপরে কয়েক বৎসর শান্তিপুর মিউনিসি-প্যালিটীর ওভারসিয়রের কার্য্য করেন।

৺প্রিয়নাথ বাবুর পর ৺দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য নামক শান্তিপুর নিবাসী কোন ব্যক্তি কিছুকাল প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। তাঁহার সময়ে ১৮৭৮ সালে শ্রীরামগোপাল আস নামক একটী বালক পরীক্ষার্থী হইয়া উত্তীর্ণ হন। পরে ঐ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ৺বিহারীলাল ভবানী প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। ইহার সময়ে ১৮৭৯ সালে তিনটী বালক মধ্য-ইংরেজি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীহারাণচন্দ্র ঘোষ ও ৺হেমচন্দ্র দালাল। এই তিনটী পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম দুইটী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অধিকন্তু শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস মাসিক ৫৲ টাকা হারে দুই বৎসর গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হারাণ বাবু সুতরাগড়ের গোপ জাতীয়। ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুদিবস হইতে সরকারি ডাক বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। সুতরা-গড়ের গোপজাতীয় আর একটি যুবাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেলওয়ের চাকুরী করিতেছেন। ইঁহার নাম শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ।

১৮৮০ সালের প্রথমেই বিদ্যালয়-গৃহ নূতন বাজারের সম্মুখস্থ নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ সমারোহের সহিত ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছিল। এই পারিতোষিক উৎসবে কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিশ্বেশ্বর দাস একটী রৌপ্যপদক এবং কয়েকখানি মূল্যবান্ পুস্তক (সর্ব্বসমেত ৩৫৲ টাকা) পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে ইনি ১৮৮২ সালে শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর একটী রৌপ্য পদক লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি নদীয়া জেলার পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৩০৲ টাকা পুরস্কারও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু

তিনি মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে দুই বৎসর গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বৃত্তিপ্রাপ্তি কালে ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ, এ, পড়িয়াছিলেন। পরে ইনি শিক্ষকতা করিতে করিতে ১৮৯২ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধুনা ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। গত বৎসর ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরেজি প্রবন্ধের জন্য "কলিকাতা রিচার্ডসন সোসাইটী"র সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামতি ষ্টীফেন সাহেবের প্রদত্ত ২০৲ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত ৪ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে দুইখানি স্কুলপাঠ্য। অপর দুইখানির মধ্যে একখানির নাম "A Discourse on the Study of Sanskrit". এই পুস্তক ইংরেজিতে লিখিত এবং পবিত্রভাব ও ওজস্বিনী ভাষার নিমিত্ত বহু সংবাদপত্রে প্রশংসিত। অপর পুস্তকখানির নাম "সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব"। ইহা বাঙ্গলায় লিখিত। 'বঙ্গবাসী', 'ভারতী', 'নব্যভারত' প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকায় এই পুস্তক অনুকূলভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। উল্লিখিত পুস্তকসকল ব্যতীত ইংরেজি ও বঙ্গভাষায় লিখিত বিশ্বেশ্বর বাবুর অনেকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রবন্ধ আছে।

সুতরাগড়ে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামের যে কতদূর মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরলোকগত বিহারীবাবুর শিক্ষকতা কালে আরও অনেক ছাত্র মধ্যইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু বিহারীবাবুর ন্যায় পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ছাত্রবৎসল শিক্ষক সচরাচর দৃষ্ট হন না। শিক্ষকতাকার্য্যে তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন এবং এই শিক্ষকতাকার্য্য করিতে করিতেই তিনি সাংঘাতিক ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন।

সুতরাগড় মধ্যইংরেজি বিদ্যালয় হইতে যাঁহারা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র প্রামাণিক ও ৺গোকুল চন্দ্র সাহার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। রাখালবাবু তন্তুবায় জাতীয়। ইনি বি, এল, পাশ করিয়া এক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতী করিতেছেন। গোকুলচন্দ্র সুবিখ্যাত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী সাহা মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। তিনি বি, এ, পাঠকালে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

ইংরেজি ১৯০০ সালে সুতরাগড় মধ্যইংরেজি বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র বি, এ, মহাশয় এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। ইনি অধুনা নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্গীয় বিহারীলাল ভবানী মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভবানী বি, এ, মহাশয় এই স্কুলের বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক।

৺গোপীচরণ নন্দী মহাশয়ের পরলোক গমনের পর স্বর্গগত সুবিখ্যাত রামগোপাল মুন্সী মহাশয় সুতরাগড় হাইস্কুলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহারও দেহান্তর ঘটিল। রামগোপাল বাবুর স্বর্গারোহণের পর হইতে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয় এই স্কুলের সম্পাদকতা করিতেছেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সুতরাগড়ে স্ত্রীশিক্ষারও প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয় সুতরাগড়ে সর্ব্বপ্রথম বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি সুতরাগড় মধ্যইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মূলেও এই রামেশ্বর বাবু। ফলতঃ রামেশ্বর বাবুকে সুতরাগড়ে শিক্ষা বিস্তারের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগী বা Pioneer of Education বলা যাইতে পারে। ইনি যৌবনকাল হইতেই চরিত্রবান্, অধ্যবসায়ী, উদ্যমশীল ও কার্য্যদক্ষ। ইংরেজি

১৮৬৮ সালে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে ইনি হাই ইংলিস স্কুলের সুযোগ্য হেড মাষ্টার এবং শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর হইয়াছিলেন। ইনি আসাম প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের অধীনে বহু উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া কয়েক বৎসর হইল অবসর ও পেন্সন লইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকল্পে কয়েকটী ছাত্রী লইয়া রামেশ্বর বাবু স্বয়ংই তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাসের বহির্ব্বাটীর ঘরে বিদ্যালয়ের প্রথম সূচনা। এই বিদ্যালয়ে ৺যামিনী বাবু বহুদিবস অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। অধুনা এই বিদ্যালয় মুন্সী পাড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষক।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিবস পরেই শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ইন্দ্র মহাশয় স্বগৃহের নিকটে "সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকগণ বড়ই সন্তুষ্ট। সম্প্রতি এই বিদ্যালয় হইতে মোদক জাতীয়া শ্রীমতী শৈববালা দাসী নাম্নী একটী বালিকা নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দুই টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বিগত ফেব্রুয়ারি মাস হইতে এই বিদ্যালয় মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল বাবু এই বিদ্যালয়ের জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন তাহাতে তিনি অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

কিছু দিবস পূর্ব্বে সুতরাগড়ের যে কয়েকজন ব্যক্তি শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং অধুনা যাঁহারা উক্ত কার্য্যে ব্রতী আছেন

তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ময়রাপাড়া নিবাসী ৺কেদারনাথ রায় মহাশয় হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের দ্বৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার সহোদর ৺ভুবনেশ্বর রায় মহাশয়ও শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। অধুনা সুতরাগড়ের ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সুতরাগড়ের আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা করিতেছেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ আচার্য্য নর্ম্যাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী আছেন। পরলোকগত শশিভুষণ আচার্য্য মহাশয়ও নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে কিছু দিবস অধ্যয়ন করিয়া বহুকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্বতন্ত্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরলোকগত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায় নর্ম্যালের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা করিতেছেন।

মোদক জাতির মধ্যে ৺হরিচরণ দে নর্ম্যাল স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া বহুদিবস শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সুতরাগড়ের নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী দৌলতগঞ্জ গ্রামের স্বর্গীয় রামচরণ ইন্দ্র মহাশয় ইংরেজি ১৮৬৭ সালে শান্তিপুর হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুদিবস স্বগ্রামে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ৺ধীরেন্দ্রকুমার ইন্দ্র এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মোদক জাতীয় ৺হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্র মহাশয়ও বহুদিবস সুতরাগড় বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন।

অধুনা মোদক জাতির মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কৃতী

হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন ইন্দ্র বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত বাবু অমলেন্দু সেন এম, এ, বি, এল, সমগ্র মোদক-সমাজের আদর ও গৌরবের পাত্র। অমলেন্দু বাবু পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ের পুত্র। ললিত বাবু ও অমলেন্দু বাবু উভয়েই ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাগড়ের সাহা পরিবারের ৺বিপিনবিহারী সাহার পুত্র শ্রীমান রাধাকৃষ্ণ সাহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সুতরাগড়ের সূত্রধর জাতীয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর শী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সওদাগারী অফিসে চাকুরী করিতেছেন।

স্বর্ণকার জাতীয়গণের মধ্যে ৺লালমোহন পাল নামক একটী যুবক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছু দিবস হইল ক্ষয়কাশ রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। স্বর্ণকার জাতীয় অপর একটী যুবক ৺পাঁচকড়ি স্বর্ণকার বি, এ, সুতরাগড়ে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। চাকদহের নিকটবর্ত্তী "সাঁতরাগাছি" গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান ছিল। পাঁচকড়ি বাবু বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে স্বর্ণকার-সমাজ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত।

যে কয়েকজন প্রথিতনামা মহাত্মার অধিষ্ঠান হেতু সুতরাগড় গ্রাম ধন্য হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে রায় বামাচরণ প্রামাণিক বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রামগোপাল মুন্সী মহাশয়ের নাম ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বামাচরণ বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এঞ্জি-নিয়ারীং কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া সরকারী পূর্ত্তবিভাগে চাকুরী আরম্ভ করেন। পরিশেষে ইনি একসিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বামচরণ

বাবুর বাটীতে বহুকাল হইতে সমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া আসিতেছে। সুতরাগড়ের 'মালঞ্চ' নামক স্থানে বামাচরণ বাবু একটী সুদীর্ঘ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর দ্বারা বহুলোকের হিত সাধিত হইয়াছে ও অদ্যাপি হইতেছে।

স্বর্গীয় রামগোপাল বাবু এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পাঠ করেন এবং এল, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি রাণাঘাট আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। রামগোপাল বাবুর পিতা ৺ভগবানচন্দ্র মুন্সী একজন অতি দয়ালু ও দানশীল পুরুষ ছিলেন। মাতৃহীন পুত্র রামগোপাল বাবুকে তিনি অতি যত্নের সহিত পালন করিয়াছিলেন। রামগোপাল বাবুর পিতৃভক্তি আদর্শস্থানীয় ছিল।

নানাবিধ দুর্লভ ও মূল্যবান্ বৈষ্ণবগ্রন্থের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-মহাশয় এই সুতরাগড়েরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাল্যে তাঁহার মাতুল স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের দ্বারাই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে অদ্যাপি ব্রহ্মচারি-মহাশয় সুতরাগড়ের মায়া ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাগড় গ্রামে তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পবিত্রমনা মহাপুরুষের পুনঃ পুনঃ শুভাগমন সকলেরই প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাগড় গ্রাম নবদ্বীপাধিপতির জমিদারি। এই জমিদারিতে বাস করিয়া প্রজাগণকে কখন কোন নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। নদীয়ার মহারাজারা পুরুষানুক্রমে সদাশয় ও প্রজাবৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং সুতরাগড়ের প্রজারাও চিরদিন রামরাজত্বে বাস করিতেছেন। রাজভক্ত প্রজারা সুতরাগড় হাইস্কুল নবদ্বীপাধিপতির নামে উৎসর্গ করিয়া উহার নাম রাখিয়াছেন —"সুতরাগড় মহারাজা অব্ নদীয়াস্ হাই ইংলিস্ স্কুল।"

নবদ্বীপাধিপতির নিযুক্ত সুতরাগড়ের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত

উক্ত গ্রামনিবাসী রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ৺গোলকচন্দ্র সরকার, ৺রামজয় ভাদুড়ী, ৺দীননাথ ভাদুড়ী, ৺শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও ৺প্যারীলাল গোস্বামী মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিবস নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শশীবাবু ও প্যারীবাবু উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশল ছিলেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয় সুতরাগড়নিবাসী বর্ত্তমান রাজকর্ম্মচারী। ইনি পূর্ব্বোল্লিখিত ৺দীননাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের পুত্র এবং ৺রামজয় ভাদুড়ী মহাশয়ের পৌত্র।

সুতরাগড় গ্রাম শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। সুতরাগড়ের অধিবাসী সংখ্যা কিঞ্চিদধিক নয় সহস্র। ইহার মধ্যে অনুমান তিন সহস্র মুসলমান। মুসলমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কয়েক ঘর সম্পন্ন পরিবার আছেন। দক্ষিণপাড়া নিবাসী মহম্মদ বেচু মিঞা একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। বহুদিবস হইতে ইনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর পদে নিযুক্ত আছেন। সুতরাগড়ের 'মালঞ্চ' নামক স্থানে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে "গাজি মিঞার বিবাহ" নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হয়। শুনা যায় 'গাজি মিঞা' আজমীর প্রদেশের একজন সাধু মুসলমান ছিলেন। হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া তিনি বিবাহদিবসে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইয়াছিল মাত্র, বিবাহ প্রকৃতপক্ষে হয় নাই। অদ্যাপি সাধুর স্মৃতির জন্য বিবাহের নানা প্রকার আয়োজন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মহম্মদীয় উৎসব উপলক্ষে অনেক হিন্দু কুলমহিলাও 'মানসা'পূর্ব্বক উপবাস করিয়া থাকেন এবং "গাজি মিঞার" উদ্দেশে সিন্নি প্রভৃতি প্রদান করিয়া জল গ্রহণ করেন।

সুতরাগড়ে অধুনা প্রায় দুই শতঘর মোদক বাস করিতেছেন।

এই মোদক সংখ্যা শান্তিপুর ধরিয়া গণনা করা হইল। কারণ সুতরাগড় ও শান্তিপুরের মোদক সমাজ পৃথক নহে। দূরবর্ত্তী সমাজের মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী দৌলতগঞ্জের মোদকগণের সহিত শান্তিপুর-সমাজের সর্ব্বদা আদান প্রদান ও আহার ব্যবহারাদি চলিয়া থাকে। আজকাল কলিকাতা ও বৰ্দ্ধমান-সমাজের সহিতও ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছে। বিদেশীয় সুসভ্য ও সুশিক্ষিত মোদক মহোদয়গণ শান্তিপুর-সুতরাগড়ের মোদক-সমাজের সহিত যোগ ও সহানুভূতি রক্ষা করেন ইহা সমাজ-হিতৈষী প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয়।

সুতরাগড়ে একটী 'রিসিভিং' পোষ্টঅফিস বা ডাকঘর আছে। ২৫ বৎসর অতীত হইল এই পোষ্ট অফিস সংস্থাপিত হইয়াছে।

সুতরাগড়ের মোদকেরা চিনির কারবার করিয়াই ঋদ্ধিমন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে সুতরাগড়ে ৫০।৬০টী চিনির কারখানা ছিল। অধুনা ঐরূপ কারখানার সংখ্যা ৫।৭টী মাত্র। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সুতরাগড়ের মোদকেরা যশোহর জেলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর নামক স্থানে অনেক চিনির কারখানা খুলিয়াছিলেন। এখনও কোটচাঁদপুরে মোদকগণের কারখানা চলিতেছে। কিন্তু ঐ কারখানার সংখ্যা অধুনা নিতান্ত অল্প। সুতরাগড়ের উন্নতিশালী মোদকগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি কলিকাতা সহরে চিনির আড়ত খুলিয়াছিলেন। এই আড়তের কারবার খুব বিস্তৃত ছিল। তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্যবসায়ী পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ মহাশয় এই আড়তে চিনি ক্রয় করিতে আসিতেন। আড়তদার মোদকগণের মধ্যে ৺গোবৰ্দ্ধন দে, ৺রামহরি দাস, ৺মহাদেব নন্দী, ৺মহেশচন্দ্র নন্দী ও ৺দীননাথ ইন্দ্রের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। পরে অনেকেই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বংশ পরিচয়।

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্ বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"কস্ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥"

মোহমুদ্গরঃ।

সুতরাগড় গ্রামে মোদক জাতির কত দিন হইতে বাস তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে অধুনা যাঁহারা সুতরাগড় বা শান্তিপুরে বাস করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ় প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিতেন এ কথা সত্য। সম্ভবতঃ অনেকেই সুপ্রসিদ্ধ "বর্গীর হাঙ্গামে"র সময় বর্দ্ধমান জেলা হইতে এখানে উঠিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে বসতি করিয়াছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম (১) বা সাত গাঁ হইতেও কেহ কেহ উঠিয়া আসিয়াছেন এরূপ শুনা যায়। সপ্তগ্রাম হইতে উঠিয়া আসা সম্বন্ধে একটী কৌতূকাবহ জনশ্রুতি বা গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে কোন মোদক দোকানদারের দোকানে রাত্রিতে মুড়কি ভিয়ান হইতেছিল। মুড়কি ঠিক জমিয়াছে কি না জানিবার জন্য বৃদ্ধ দোকানদার কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল "মরিয়াছে?" কর্ম্মচারী উত্তর করিল "এখনও মরে নাই।" বৃদ্ধ

(১) ইতিহাস পাঠকের নিকট 'সপ্তগ্রাম' নাম সুপরিচিত। হুগলি ও কলিকাতা বন্দর হইবার বহুপূর্ব্বে সপ্তগ্রামই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান বন্দর ছিল। বৈষ্ণবপাঠক অবশ্যই জানেন এই সপ্তগ্রামই ছয় গোস্বামিগণের অন্যতম শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্মস্থান।

কহিল "বোরা (থলিয়া) চাপা দে"। দৈবক্রমে সেই স্থান দিয়া একজন রাজকর্ম্মচারী যাইতেছিলেন। তখন মুসলমান নবাবদিগের আমল। রাজকর্ম্মচারী মনে করিলেন দোকানদার কোন ব্যক্তিকে খুন করিতেছে। সুতরাং হতভাগ্য মোদক ধৃত হইল। সে অনেক বুঝাইলেও তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার হইল। এই ঘটনার পর কয়েকটা মোদক-পরিবার আপনাদিগের তারু ও খুন্তি ভূমিতে প্রোথিত করিয়া, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা উক্তস্থানে মোদকের ব্যবসায় না করিতে পারেন এমন কি জলগ্রহণও না করিতে পাবেন তজ্জন্য তাহাদিগকে ভীষণরূপে অভিশপ্ত করতঃ চিরদিনের মত সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসেন। অদ্যাপি বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার বহুস্থানে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, মুরসিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় অনেক প্রকৃত মোদকের বসতি আছে। চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী 'সুখচর' প্রভৃতি স্থানে অনেক প্রকৃত মোদকের বাস আছে। শান্তিপুর-সুতরাগড়ের মোদকদিগের সহিত উল্লিখিত স্থানের মোদকদিগের আদান প্রদান অবাধে চলিয়াছে এবং চলিতেছে। কিন্তু শান্তিপুর-সমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিদেশস্থ মোদক-সমাজের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠতা নাই। ইহাতে সামাজিক উন্নতির পথে কাঁটা পড়িয়াছে। যতদিন আমরা বিদেশীয় সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া পরস্পরের সহিত সহানুভূতি না করিতে শিখিব ততদিন আমাদের সমাজের কল্যাণ নাই। এতদর্থে বিদেশীয় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আমাদের প্রত্যেক সামাজিক উৎসবে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করা আবশ্যক। সমাজের মধ্যে যাঁহারা ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী তাঁহারা অনায়াসেই এইরূপে সামাজিকতার সম্প্রসারণ করিয়া সমাজ শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিতে পারেন।

মোদকজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয়রূপে কিছু জানা যায়

না। কোন কোন পুরাণ মতে শূদ্রার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে মোদক জাতির উৎপত্তি। তাহা হইলে মোদকজাতি বর্ণসঙ্কর। আজকাল অনেকে বঙ্গদেশীয় বর্ণসঙ্কর জাতিকে বৈশ্য, এমন কি কেহ কেহ ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিতেও চেষ্টা পাইতেছেন। এ চেষ্টা কতদূর সঙ্গত বলা যায় না। যাহা হউক মোদকজাতি চিরদিন সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদের জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের আচরণীয়। বিশেষতঃ ইঁহাদের হস্তে প্রস্তুত মোদকাদি মিষ্টান্নসকল চিরদিন দেবসেবা ও ব্রাহ্মণ সেবার নিমিত্ত সাদরে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। অধুনা কাল-প্রভাবে অন্যান্য অনেক নিকৃষ্ট জাতি মোদকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ও আচারবান্ ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাতসারে কখনই তাহাদের প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ব্যবহার করেন না।

এস্থলে বলা আবশ্যক 'কুরী' ময়রা নামক আর এক শ্রেণীর মোদক বঙ্গদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত জাতি-মোদকদিগের সহিত তাঁহাদের আহার ব্যবহারাদি নাই। মূলে তাঁহারা জাতি-মোদকদিগের সহিত এক না হইতেও পারেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মধুমোদকগণ আদৌ ময়রা নহেন।

ঢাকাই ময়রাদিগের মধ্যে 'একপাটিয়া' ও 'দোপাটিয়া' নামে দুইটী থাক্ দৃষ্ট হয়। পরন্তু মধ্যবাঙ্গলার মোদকদিগের মধ্যে ৪টি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বা থাক্ আছে। যথা রাঢ়াশ্রম, মোঢ়াশ্রম বা ময়ূরাশ্রম, অজাশ্রম এবং ধর্ম্মাশ্রম বা ধর্ম্মসূত।

প্রকৃত মোদকদিগের মধ্যে ১৬টী বিভিন্ন পদবী দৃষ্ট হয়। যথা, আস, দাস, নন্দী, বরা, চন্দ্র, দে, দেঁ, দত্ত, দানা বা দাঁ, গুঁই, ইন্দ্র, লাহা, নাগ, রক্ষিত, সেন, রাজ বা রুজ।

এই সকল উপাধিধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে আস, দাস নন্দী ও বরা কুলীন ও অপর সকলে মৌলিক। কোন কোন স্থানে মৌলিকগণকে কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতে হইলে কুলমর্য্যাদা দিতে হয়।

মোদকদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ, মৌদগল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, গৌতম, অম্বরীষ, মধুঋষি, চন্দ্রঋষি, গণেশঋষি, সোমঋষি, ময়ূরঋষি প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত আছে।

মোদকেরা নবশাখ বা নবশায়ক বলিয়া গণ্য। ইঁহারা কায়স্থ সদৃশ সদাচারসম্পন্ন। সুতরাং ইঁহাদের পুরোহিত ও কায়স্থদের পুরোহিত অনেকস্থলে এক।

মানভূমের ময়রারা মোহনগিরি, সাহেবসিয়া, ষষ্ঠী ও ভাদুপূজায় ছাগবলি প্রদান ও মিষ্টান্নাদি উপসর্গ করেন। এই সকল পূজায় ব্রাহ্মণের যাজকতা করিবার আবশ্যকতা নাই। (১)

'আস', 'দাস', 'নন্দী' ও 'বরা' উপাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে মুড়কি ভিয়ান উপলক্ষে সপ্তগ্রামের কোন মোদক-দোকানদার মুসলমান রাজপুরুষগণের হস্তে বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। শুনা যায় প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য রাজপুরুষেরা একে একে সমস্ত মোদকগণকেই তলব করেন। অনেকে নানা কৌশলে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাঁহারা 'আসি' বলিয়া ফাঁকি দেন, তাঁহাদের উপাধি হইয়াছিল 'আস'। কতকগুলি মোদক ধৃত হন এবং রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে করাত দিয়া কাটিবাব ভয় দেখান। এই ঘটনা হইতে 'দাস' উপাধিধারী মোদকগণকে 'করাতী দাস' কহে। কতকগুলি মোদককে ত্রিশূল চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। ইঁহারাই 'নন্দী' নামে প্রসিদ্ধ। এইজন্য অদ্যাপি নন্দীদিগকে 'ত্রিশূলী নন্দী' বলা হয়। 'বরা' উপাধিধারী মোদকগণকে বরাহ বা শূকরের ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কারণ আস,

---

(১) মোদকজাতির উৎপত্তি ও আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা প্রায়শঃ 'বিশ্বকোষ' নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধান হইতে সংগৃহীত।

দাস, নন্দী প্রভৃতি উপাধি, মোদক ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

মোদকদিগের মধ্যে যাঁহারা 'প্রামাণিক' বলিয়া খ্যাত তাঁহারা মূলে 'বরা' বা 'দাস' উপাধিধারী ছিলেন। কালক্রমে 'প্রামাণিক' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। 'দে' উপাধিধারী কোন কোন মোদক-পরিবার কার্য্যসূত্রে 'বিশ্বাস' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাগড়ে 'বিশ্বাস' উপাধিধারী কয়েক ঘর মোদক আছেন। যথাস্থলে তাঁহাদের বিবরণ লিখিত হইবে। মোদকদিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার প্রায়শঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের ন্যায়। ৺গণেশ মোদকজাতির কুলদেবতা। এই নিমিত্ত মোদকেরা শীত ঋতুতে গণেশপূজা না করিয়া ইক্ষুজাত শর্করায় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন না। মোদকেরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী, কেহ কেহ শাক্তও আছেন। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে ইঁহাদের গোঁড়ামি নাই। শাস্ত্রোক্ত সকল দেবদেবীর প্রতিই ইঁহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী মোদকদিগের গৃহেও যথারীতি দুর্গা, কালী প্রভৃতি শক্তি পূজা হইয়া থাকে।

মোদকদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত এই প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। মোদকেরা স্বজনবিয়োগস্থলে ৩০ দিবস অশৌচ ভোগ করিয়া, ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ ও তদন্তে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া থাকেন।

শান্তিপুর-সুতরাগড়ের 'দাস' উপাধিধারী মোদকেরা 'বাকতা'র দাস বলিয়া খ্যাত। শুনিতে পাওয়া যায়, বর্দ্ধমান জেলায় 'বাকতা' নামে একটী পল্লীগ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ ঐ 'বাকতা' গ্রাম হইতেই 'দাস' উপাধিধারিগণ এখানে উঠিয়া আসিয়া থাকিবেন। 'দাস' উপাধিধারীদিগের আদিপুরুষ গণেশচন্দ্র দাস। তদূর্দ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায় নাই। যথাস্থলে 'দাস' গণের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

পিতা ও পিতামহ।

পিতামহস্য জগতো মাতাধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দাসবংশের আদিপুরুষ গণেশচন্দ্র দাস। এই গণেশচন্দ্র দাসের পুত্র নারায়ণচন্দ্র দাসের সন্তান সন্ততিই শান্তিপুর—সুতরাগড়ের মোদক দাসবংশ বলিয়া পরিচিত। কার্ত্তিকচন্দ্র এই নারায়ণচন্দ্র দাসের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ৺মাণিকচন্দ্র দাসের পুত্র। ইনি পিতার একমাত্র সন্তান। কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতামহের নাম ৺দুর্ল্লভচন্দ্র দাস। কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতামহী বিশ্বেশ্বরী দাসী দৌলতগঞ্জ নিবাসী ৺কালীশঙ্কর ইন্দ্রের কন্যা ছিলেন। দুর্ল্লভচন্দ্র বরাবর সুতরাগড়ের দক্ষিণ পাড়াতেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি সবল, সুঠাম ও দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মাণিকচন্দ্র এবং একমাত্র কন্যা মহামায়া দাসী। এক্ষণে উভয়েই পরলোকগত। মাণিকচন্দ্রের বয়স যখন ৫ বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। বিপত্নীক দুর্ল্লভচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় ভার্য্যা মনোমোহিনী দাসী শান্তিপুর নিবাসী ৺মাধবচন্দ্র ইন্দ্রের কন্যা। ১০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণ পাড়ার বাটীতেই কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্ম হয়। কার্ত্তিক-চন্দ্রের জননী শ্রীমতী কেদারেশ্বরী দাসী সুতরাগড়ের ৺বলাইচাঁদ 'দে'র কন্যা। কার্ত্তিকচন্দ্র মাতাপিতার পরিণত বয়সের সন্তান। কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন সন্তান হয় নাই। কার্ত্তিক-চন্দ্রের যখন জন্ম হয় তখন তাঁহার জননীর বয়স ২৫ বৎসর অতিক্রম

করিয়াছিল এবং পিতার বয়সও অন্যূন ত্রিংশৎ বৎসর হইয়াছিল। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের মূলে একটী সাধুর আশীর্ব্বাদের সংবাদ পাওয়া যায়। শুনা যায় মাণিকচন্দ্রের প্রথম যৌবনে পুত্রাদি না হওয়ায় তিনি কিঞ্চিৎ মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। চিত্তে বোধ হয় কিছু বৈরাগ্য-ভাবও আসিয়াছিল। এইজন্য তিনি বিষয়কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই শান্তিপুর শ্যামচাঁদপাড়ার বৈষ্ণববাবাজীদিগের আখড়ায় ঘুরিতেন। বৈষ্ণবদের সহিত আলাপ ও কীর্ত্তনাদিতে তিনি বেশ আনন্দ অনুভব করিতেন। কীর্ত্তনে রুচি তাঁহার শেষদশা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। এই কালেই বোধ হয় তিনি খোল প্রভৃতি বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি ৺শ্যামচাঁদ বিগ্রহ বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে একটী সাধুব সন্দর্শন লাভ করেন। অন্যান্য অনেক কথার পর, সাধুকে তিনি নিজ পুত্রহীনতার কথা জ্ঞাপন করেন। সাধু তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলেন—"আমার আশীর্ব্বাদে তোমার পুত্র লাভ হইতে পারে। কিন্তু তোমাকে একটী বিষয়ে আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিতে হইবে। পুত্র জন্মিলে উপযুক্ত বয়সে তাহাকে আমার নিকট দীক্ষিত করিতে হইবে।" মাণিকচন্দ্র এই কথায় একটু চিন্তাপূর্ব্বক উত্তর করিলেন—"বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যদি পুত্রমুখ দর্শন করিতে পাই, এবং ঐ পুত্র যদি দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয়, তবে আমি সে সময় আপনাকে পাইব তাহার স্থিরতা কোথায় এবং আপনাকে না পাইলেই বা কিরূপেই আমাব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব?" সাধু কহিলেন—"সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। পুত্রের পঞ্চমবর্ষ অতীত হইলে তুমি যদি আমার দর্শন না পাও, তবে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত কোন অপরাধ তোমার হইবে না।" মাণিকচন্দ্র অতঃপর ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে সাধুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। শুনা যায়, এই-সময় সাধু তাঁহাকে পুত্রলাভার্থ কি ঔষধও প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিবস পরে কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী গর্ভবতী হন। যথাসময়ে তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রকে প্রসব করেন; কার্ত্তিকচন্দ্র পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিলে পর পূর্ব্বকথিত সাধুর অনেক সন্ধান করা হইয়াছিল। কিন্তু মাণিকচন্দ্র আর তাঁহার দর্শন পান নাই।

মাণিকচন্দ্রের সাধুভক্তি তাঁহার চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল। একদিবস মাণিকচন্দ্র সায়ংকালে উত্তরপাড়া হইতে দক্ষিণপাড়াস্থিত নিজ বাটীতে গমন করিতেছিলেন। পথে যাইতে অধুনা যেথানে ফকীর বটী রহিয়াছে ঐ স্থানের নিকট দেখিলেন একটী সাধু কোন দোকানে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। তৎকালে ফকীর বাটীর নিকট প্রশস্ত ময়দানে মৎস্য ও ফল তরকারির বাজার বসিত। সাধুকে দেখিতে পাইয়া মাণিকচন্দ্র তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর সাধু অভুক্ত আছেন শুনিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাধু মাণিকচন্দ্রের ভক্তি দেখিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদিবস পূর্ব্বে মাণিকচন্দ্র ৩॥০ মূল্যে একটী গাভী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই গাভী প্রতিবারে ⁄৮ সের দুগ্ধ দান করিত। মাণিকচন্দ্র সাধুকে গৃহে লইয়া যাইয়া পরিতোষরূপে দুগ্ধ পান করাইলেন এবং অন্যান্য খাদ্যেরও আয়োজন করিয়া দিলেন। মাণিকচন্দ্রের পিতা মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু মাণিক-চন্দ্রের সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সাধুসেবায় তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন। শুনা যায় এই সাধু মাণিকচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান—"তুমি সৌভাগ্যশালী হইবে।" ক্রমে কার্ত্তিকচন্দ্রের যখন নয় বৎসর বয়স হইল, তখন মাণিকচন্দ্রের বিমাতার ব্যবহারে তাঁহার ও তাঁহার পিতা দুর্ল্লভচন্দ্রের মধ্যে আর বড় সদ্ভাব রহিল না। শেষে এমন হইল যে উভয়ের এক বাটীতে বাস করা কঠিন

হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় মাণিকচন্দ্র পিতৃসম্পত্তি ১০,০০০ মুদ্রা লইয়া পিতাব নিকট হইতে পৃথক্ হয়েন। পৃথক হইয়া তিনি সুতরাগড়ের "ষড়ভুজ" পাড়ায় একটী স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, তিনি আর কোন সময়ে পিতার নিকট হইতে আরও ৫০০০ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে মাণিকচন্দ্রের পিতৃধন মাত্র ১৫,০০০ মুদ্রা। কালে এই ১৫০০০ মুদ্রা মাণিকচন্দ্রের হস্তে কয়েক লক্ষ মুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের এই সৌভাগ্যের মূলে সাধুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তমান ছিল।

শৈশব হইতেই মাণিকচন্দ্র অতি শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পিতা দুর্ল্লভচন্দ্র জীবনের পূর্ব্বাবস্থায় সামান্ত মোদকের ব্যবসায় করিতেন। পরে ইনি সুতরাগড়ের বিশ্বাস বংশীয় প্রসিদ্ধ পুরুষ ৺বদনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের চিনির কারখানায় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। এই কারখানা যশোহর জেলার অন্তর্গত কোট-চাঁদপুর মোকামে সংস্থাপিত ছিল। কিছুদিবস চাঁদপুরে কার্য্য করিয়া দুর্ল্লভচদ্র নিজে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। এবং স্বয়ং স্বনামে একটী কারখানা চালাইতে থাকেন। মাণিকচন্দ্র প্রথমে পিতার সহিত চাঁদপুরে যাইতেন এবং পিতার কারখানাতেই কার্য্য করিতেন। কোটচাঁদপুর গমন করিতে হইলে ইষ্টার্ণবেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া পদব্রজে বা শকটের সাহায্যে উক্ত মোকামে যাইতে হয়। তৎকালে শান্তিপুর বা রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণগঞ্জ গতায়াত করিবার রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং পদব্রজে বা গোশকটের সাহায্যেই সকলকে গমনাগমন করিতে হইত। মুটিয়ার মাথায় দিয়া টাকার বস্তা লইয়া যাইতে হইত। দস্যুভয় যথেষ্ট ছিল। সুতরাং টাকার মোট সঙ্গে লইয়া যাওয়া সর্ব্বদাই বিপজ্জনক ছিল। মাণিক-

চন্দ্র অনেক সময় এইরূপে মুটিয়া সঙ্গে লইয়া বিদেশে যাইতেন। কিন্তু তিনি কখন দস্যুহস্তে পড়েন নাই। এই সময় চাঁদপুরে ম্যাকলিয়ড্ নামক কোন ইংরেজ সওদাগর একটী নীলকুটী চালাইতে ছিলেন। ক্রমে তিনি অত্যন্ত ধনী হইয়া পড়েন। চাঁদপুর মোকামের বিশ্বাসী মোদকদিগকে অনেক সময় তিনি ঋণস্বরূপ অর্থ প্রদান করিতেন। এইরূপ তেজারতি কারবারে সাহেবের বিলক্ষণ লাভ ছিল। এই কারবার সূত্রে মাণিকচন্দ্র সাহেবের নিকট সুপরিচিত হন। ক্রমে তিনি সাহেবের এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে তিনি নিজের নামাঙ্কিত একটী চাপরাস ও একখানি তরবারি মাণিকচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই চাপরাস ও তরবারি সঙ্গী কোন ব্যক্তিকে দিয়া মাণিকচন্দ্র নির্ভয়ে বিদেশে দুর্গম পথে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সঙ্গীকে দেখিয়া তাঁহাকে লোকে সাহেবের লোক মনে করিত। সুতরাং দস্যুহস্তে তাঁহার অর্থাদি লুণ্ঠনের ভয় ছিল না। ক্রমে সাহেব মাণিকচন্দ্রকে এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে অনেক সময়ে তাঁহাকে লৌহসিন্দুক হইতে স্বীয় প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া লইবার জন্য চাবী প্রদান করিতেন, এবং টাকা লইবার সময় স্বয়ং সেখানে উপস্থিতও থাকিতেন না। এক দিবস মাণিকচন্দ্র সাহেবের নিকট কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করেন। সে সময় সাহেবের কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। সাহেব ও তদীয় পত্নী স্বচ্ছন্দে আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহারা মাণিকচন্দ্রকে চাবী দিয়া প্রার্থিত অর্থ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া লইতে কহিলেন। মাণিকচন্দ্র কর্ম্মের লোক, অধিক সময় অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগত্যা স্বয়ং টাকা বাহির করিতে গেলেন। এই সময় সাহেব বলিয়া দিলেন, "সিন্দুকে ৩০,০০০ হাজার টাকার নোট আছে, তাহা হইতে তোমার প্রার্থিত অর্থ লইবে।" মাণিকচন্দ্র সিন্দুক খুলিয়া

সর্ব্বাগ্রে মোট কত টাকা আছে গণনা করিলেন। গণিয়া দেখেন সাহেবের কথা ঠিক নহে। সিন্দুকে মাত্র ২৮০০০ টাকার নোট রহিয়াছে। তিনি তখন কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া, টাকা পুনরায় গণিলেন। এইরূপ দুই তিন বার গণনা করিয়াও দেখিলেন, সিন্দুকে ২৮০০০ টাকা মাত্র আছে। তখন তিনি সাহেবকে সে কথা জানাইলেন। সাহেব কহিলেন—"আচ্ছা, তুমি তোমার প্রার্থিত অর্থ লইয়া যাও। সিন্দুকে প্রকৃত কি ছিল না ছিল আমি কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিব।" মাণিকচন্দ্র কহিলেন—"সাহেব, আমি যদিও অত্যন্ত ব্যস্ত, তথাপি আপনার কর্ম্মচারী যতক্ষণ না আসিতেছেন ততক্ষণ কিছুতেই এখান হইতে যাইব না। সিন্দুকে কত অর্থ ছিল, ঠিক না জানিতে পারিলে আমার মন কিছুতেই সুস্থ হইবে না। আপনি যখন বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে চাবী সমর্পণ করিয়াছেন, এবং আমিও বিনা আপত্তিতে সেই চাবী লইয়া সিন্দুক খুলিয়াছি, তখন আপনার টাকার জন্য আমিই দায়ী।" এই কথা শুনিয়া সাহেব হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন —"আপনারই আদেশমত কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমি অমুক ব্যক্তিকে দুই সহস্র মুদ্রা ঋণদান করিয়াছি। আপনি বোধ হয় সে বিষয় বিস্মৃত হইয়াছেন।" কর্ম্মচারীর উত্তর শুনিয়া মাণিকচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন এবং অর্থ লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের সাধুতা দর্শন করিয়া সাহেব ও তদীয় সহধর্ম্মিনী বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, মাণিকচন্দ্র চিরদিন সাহেবের নিরতিশয় বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন।

এইরূপ সাধুতা বলে মাণিকচন্দ্র কালে নদীয়া জেলার একজন প্রসিদ্ধ ধনী হইয়া উঠেন। কিরূপে তিনি সৌভাগ্য-সোপানে আরূঢ় হন তাহার ইতিবৃত্ত যতদূর জানা গিয়াছে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পিতৃগৃহ হইতে মাণিকচন্দ্র যখন পৃথক হইয়া আইসেন তাহার কিছুকাল পর হইতেই তিনি নিজনামে ও নিজদায়িত্বে কারবার করিতে লাগিলেন। চাঁদপুরে তাঁহার পিতারও চিনির কারবার ছিল। কিন্তু মাণিকচন্দ্র পিতার কারবারের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিলেন না। স্বয়ং কারখানা চালাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মাণিকচন্দ্র অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি কখন কোন প্রকার বিলাসসামগ্রী ব্যবহার করিতেন না এবং আলস্যে সময়াতিপাত করিতেন না। চিরদিনই তাঁহার প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস ছিল। একদিন প্রাতে উঠিয়া তিনি কারখানার নিকট ভ্রমণ করিতে ছিলেন। একজন সাধু সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া গঞ্জিকা সেবনের জন্য ৪টী পয়সা চাহিলেন। মাণিকচন্দ্র তাঁহাকে সাদরে নিজ কারখানায় লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সাধু কহিলেন—"আমি গৃহীর আবাসে প্রবেশ করিব না।"

এই সময় সাধুর গলদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া মাণিকচন্দ্র দেখিলেন, যে তথায় একগাছ গ্রন্থিযুক্ত স্থূল রজ্জু লম্বিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া তিনি সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা,. আপনার গলায় এ দড়া কেন? হিন্দুসাধুর গলে তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা থাকে। মুসলমান সাধুর গলে স্ফটিকের মালা দেখা যায়। কিন্তু দড়া ত কাহারও গলে দেখি না।" এই কথা শুনিয়া সাধু ঈষদ্ধাস্য করিলেন। পরে কহিলেন —"বাপ, আমি হিন্দু কি মুসলমান তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আমার গলায় কেন দড়া আছে, তাহা জানিবারও তোমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমাতে কিঞ্চিৎ ভক্তি আছে। অতএব এস তোমাকে আমি একটী বর প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া সাধু নিকটস্থ প্রাঙ্গনে উদীয়মান প্রাতঃসূর্য্যের সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে আসীন রহিলেন। কয়েক দণ্ড অতিবাহিত হইল, সাধু সমভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। চক্ষু হইতে

দরদরধারে অশ্রু পতিত হইয়া সম্মুখস্থ মৃত্তিকা পরিষিক্ত হইয়া গেল। এই ব্যাপার কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া, মাণিকচন্দ্র কারখানার কোন স্থানে বসিয়া বিষয়কার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন। সাধু যখন আসন হইতে উত্থিত হইলেন, তখন মাণিকচন্দ্র পয়সা গণিতেছিলেন। তিনি ব্যস্তভাবে এক অঞ্জলি পয়সা লইয়া সাধুর হস্তে প্রদান করিতে গেলেন। কিন্তু সাধু চারটীর অধিক পয়সা গ্রহণ করিলেন না। মাণিকচন্দ্র কহিলেন,—"বাবা, পরেও ত গঞ্জিকার প্রয়োজন হইবে। অতএব পয়সা রাখুন।" সাধু কহিলেন "কল্যকার ভাবনা আমি ভাবি না।" এই বলিয়া প্রস্থানকালে মানিকচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন— "তুমি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ তদ্বিষয়ে তোমার মঙ্গল হইবে।" এই আশীর্ব্বাদই মাণিকচন্দ্রের সৌভাগ্যের মূল। বস্তুতঃ এই ঘটনার পর তিনি যে ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তাহাতেই লাভবান্ হইয়াছিলেন। যে বৎসর সাধু আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, সেই বৎসরই চাঁদপুরের চিনির ব্যবসায়ে অনেকেরই ক্ষতি হইল। মাণিকচন্দ্রের পিতা দুর্লভচন্দ্রেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। কিন্তু মাণিকচন্দ্র সেই বৎসরই ১৫০০ টাকা লাভ করিলেন। তখন ইন্‌কম্ ট্যাক্সের সৃষ্টি হইয়াছে। যশোহরের ডেপুটী কলেক্টর কারখানাদারদিগের ব্যবসায়ের লাভালাভের তদন্ত করিবার জন্য স্বয়ং চাঁদপুরে আগমন করিলেন। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক মহাজনের খাতাপত্র পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন সকলেই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত। অতঃপর তিনি মাণিকচন্দ্রের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাঁহার ১৫০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। তখন তিনি মাণিকচন্দ্রকে কহিলেন—"দেখ এই চাঁদপুরে ব্যবসাদার-দিগের মধ্যে আমি তোমাকেই একমাত্র সত্যপরায়ণ দেখিতেছি। আর সকলে গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তুমি খাতাপত্র ঠিক রাখিয়াছ, কোনরূপ প্রবঞ্চনা নাই।" এই কথায়

মাণিকচন্দ্র উত্তর করিলেন—"হুজুর, এ বিষয়ে আমি সত্য কথা কহিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক বিশ্বাস করুন। আপনি এখানকার অন্যান্য ব্যবসায়ীকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক মনে করিতেছেন, তাহা ঠিক নহে। ব্যবসাদারেরা সত্য সত্যই এবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। আমি যে ১৫০০৲ টাকা লাভ করিয়াছি তাহার মূলে আমার কোন কৃতিত্ব নাই। এ বিষয়ে সাধুর কৃপাই মূল।" এই বলিয়া তিনি সাধুর আশীর্ব্বাদের কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। ডেপুটী কলেক্টর বাবু মাণিকচন্দ্রের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন এবং কহিলেন "যতদিন এ জেলায় আমি রহিব আর কখন তোমার খাতা-পত্র পরীক্ষা করিব না। তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিবে। অধিকন্তু আমার পরে যাহারা ডেপুটী কলেক্টররূপে এ জেলায় আসিবেন যাহাতে তাঁহারাও তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব।" বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। সাধুতাগুণে মাণিকচন্দ্র সকল বিষয়েই জয়ী হইয়াছিলেন।

মাণিকচন্দ্র এইরূপে ব্যবসায়সূত্রে বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ করেন এবং পরিশেষে বাৎসরিক ৪০০০৲ টাকা আয়ের একটা জমিদারীও ক্রয় করেন।

কিন্তু সামান্য ব্যবসায়ী মাণিকচন্দ্র প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও কিছুমাত্র গর্ব্বিত বা উদ্ধত হয়েন নাই। তাঁহার ন্যায় নিরীহ ও নির্দ্দোষ লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি গ্রাম্য কোন দলাদলি বা বিবাদ বিসম্বাদে থাকিতেন না। সর্ব্বদাই লোককে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতেন। লোকে মুখের উপর তাঁহাকে অপমান করিলেও তিনি কোন বাক্যব্যয় করিতেন না। খলতা বা হিংসা প্রভৃতি নীচবৃত্তি তাঁহাতে আদৌ

স্বর্গীয় মাণিকচন্দ্র দাস

ছিল না। তিনি কখনও কাহারও অনিষ্ট করিতেন না; সর্ব্বদাই শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। শেষবয়সে তিনি ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র শুনিতে ভাল বাসিতেন এবং সাগ্রহে ভগবৎ নামানুকীর্ত্তন করিতেন ও শ্রবণ করিতেন। মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে তিনি সুতরাগড়ের বসতি বাটীর নিকট কয়েক মাসের জন্য পুরাণপাঠ ও কথকতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ৺বারাণসীধামে ভাগীরথী তীরে একটী বাটী ক্রয় করেন, এবং সেই অবিমুক্তধাম পুণ্যক্ষেত্র কাশীতে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়।

মাণিকচন্দ্র গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূলকায় ও সুপুরুষ ছিলেন। আমি আমার বাল্যবয়সে তাঁহার চক্ষুর ভঙ্গি ও মূর্ত্তিতে কৈলাসেশ্বর মহাদেবের সাদৃশ্য দেখিতাম। বস্তুতঃ মাণিকচন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি এক দিবস অনুরাগভরে কহিলেন—"৺বারাণসী ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরের আরত্রিক দর্শনে মনে যেরূপ যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দের উদ্রেক হয়, তদ্রূপ আর কোথাও হয় না।" আমি অনেক সময়ে মাণিকচন্দ্রকে নিষ্ঠার সহিত হরিনাম জপ করিতে দেখিয়াছি।

মাণিকচন্দ্র বিলাসিতাশূন্য ছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রভূত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার কিছুমাত্র বিলাসিতা ও অপব্যয় দেখা যাইত না। এজন্য অনেকে তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিত। বস্তুতঃ স্বোপার্জ্জিত অর্থের ব্যয়বিষয়ে তিনি নিতান্ত সাবধান ছিলেন। কিন্তু ন্যায্য ব্যয়ে তিনি কখন কুণ্ঠিত হয়েন নাই। নূতন বাটীতে তিনি অনেকবার দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদিও তিনি যথারীতি সম্পন্ন করিতেন। বোধ হয় তিনি মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার নামের

সহিত কার্পণ্য অপবাদ সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা মাণিক-চন্দ্রের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন বা অদ্যাপি করিয়া থাকেন তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, মাণিকচন্দ্র সাধারণ লোকের ন্যায় বিলাসী বা অপব্যয়ী হইলে কার্ত্তিকচন্দ্র বা তাঁহার সন্তানসন্ততির দ্বারা দেশের কোন্ হিতকর কার্য্য সাধিত হইত বা হইবার সম্ভাবনা থাকিত? এক পুরুষে অর্থের সঞ্চয় এবং অপর পুরুষে তাহার ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাই চিরন্তন নিয়ম। মাণিক-চন্দ্রের পরিবারেও এ পর্য্যন্ত তাহাই হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে। এ বিষয়ে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাণিকচন্দ্রের কোন অপরাধ দর্শন করিবেন না। এই সূত্রে আরও একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সঞ্চয়প্রবৃত্তি অধুনা বাঙ্গালী জাতির বড় অধিক দেখা যায় না। বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে সঞ্চয় না করিয়া ব্যয় করিবার জন্যই উন্মুখ। এ কথা শুধু অর্থ সম্বন্ধেই সত্য নহে। জীবনের অনেক ব্যাপার সম্বন্ধেই এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। ফলতঃ যিনি উত্তমরূপে ব্যয় করিতে মানস করেন তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে উত্তমরূপে সঞ্চয় শিক্ষা করিতে হইবে। এই সঞ্চয় প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে দেশের সর্ব্বব্যাপী দুঃখদারিদ্র্য কখনই দূর হইবে না। বৈষয়িকউন্নতিকামী বুদ্ধিমান পাঠক এ বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

যাহা হউক মাণিকচন্দ্রের কৃপণতার কলঙ্ক তাঁহার সুযোগ্য ও সদাশয় পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষালিত হইতেছে।

মাণিকচন্দ্র শিক্ষিত লোক ছিলেন না। ইংরেজি, বাঙ্গালা, পারসী, কিছুই তিনি শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি অতিশয় প্রখর ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার বিষয়বুদ্ধির নিকট সকলেই পরাজিত হইতেন। তিনি আইন না পড়িয়াও আইনের কূট তর্ক বুঝিতেন

এবং বিষয়ীলোকদিগকে বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে বিজ্ঞজনোচিত অতি সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। তিনি অশিক্ষিত হইয়াও দলিল দস্তবেজাদির মুসাবিদা এমন সুন্দরভাবে করিয়া দিতেন যে তাহা দেখিয়া প্রসিদ্ধ ব্যবহার-জীবীরাও বিস্মিত হইয়া যাইতেন।

ফল কথা কোন কোন দোষ সত্ত্বেও মাণিকচন্দ্র একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মাত্মা ছিলেন কি না তাহা যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্দর্শী পরম-দেবতা তিনিই জানেন। আমি যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি বা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গেলাম।

বাঙ্গালা ১২৯৭ সনে কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতামহ দুর্ল্লভচন্দ্রেব মৃত্যু হয়। মাণিকচন্দ্র ১৩১৭ সালের ১২ই পৌষ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পব তাঁহার কীর্ত্তিমান্ পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র কয়েকটী সৎকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। সে সকল যথাস্থানে বিবৃত হইবে। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার একটী পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই প্রতিমূর্ত্তি যথাযথভাবে খোদিত হইয়াছে ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে প্রস্তরফলকে মাণিকচন্দ্রের গুণাবলী যে কয়েকটী বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক অক্ষরে আমি বিশ্বাস করি। ঐ খোদিতলিপি ইংরেজি ভাষায় রচিত। নিম্নে তাহার কিয়দংশের অনুলিপি ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

A bright example of self-help, untiring perseverance, honest labour and peifect peace with all men. He lived and died a strict Hindu.

স্বাবলম্বন, অক্লান্ত অধ্যবসায়, ধর্ম্মসম্মত পরিশ্রম এবং যাবৎ মনুষ্যের সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণশান্তিময় ভাবের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনে মরণে তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ হিন্দুছিলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী শ্রীমতী কেদারেশ্বরী দাসী একটী গুণবতী

রমণী। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্নেহময়ী ও পুত্রবৎসলা দর্শন করিয়াছি। তাঁহার ভাব দেখিয়া অনেক সময় আমার তাঁহাকে নন্দরাণী যশোমতীর সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। বক্ষের ধন কার্ত্তিকচন্দ্রকে সত্য সত্যই তিনি বক্ষে রাখিয়া পালন করিয়াছেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া দিতেন। পরিণত বয়সে যখন কার্ত্তিকচন্দ্র অল্পদিবসের জন্যও প্রবাসে গমন করিয়াছেন, দেখিয়াছি স্নেহময়ী জননী বাৎসল্যভরে বাটী হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পুত্রের অনুগমন করিয়াছেন।

ধনবান্ স্বামী ও বহু ঐশ্বর্য্যশালী পুত্রলাভ করিয়াও কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী একদিনের তরেও সৌভাগ্যগর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই। প্রতি-বাসীদের বিপদে আপদে তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের গৃহে গমন করিতেন। স্বামীর অগোচরে তাঁহার অনেক সাত্ত্বিক দানের কথাও শুনা যায়। আমি অনেক সময়ে তাঁহাকে অতি মিষ্টবাক্যে শোকার্ত্ত জনের শোক সান্ত্বনা করিতে দেখিয়াছি। দুরারোগ্য রোগে তিনি এক্ষণে স্তম্ভিত-প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। লোক-সমাজে তিনি আর মিশিতে পারেন না। ভগবন তাঁহার চিত্তে শান্তি প্রদান করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যাশিক্ষা ও বিবাহ।

"অপ্রিয়বচনদরিদ্রৈঃ প্রিয়বচনাঢ্যৈঃ স্বদারপরিতুষ্টৈঃ।
পরপরিবাদনিবৃত্তৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিন্মণ্ডিতা বসুধা॥"

নীতিশতকং

১৭৮০ শকের (ইংরেজি ১৮৫৯ সালের) মাঘ মাসের ৩০শে তারিখে পঞ্চমীতিথিতে শুক্রবারে কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্ম হয়। সুতরাগড়ের দক্ষিণ পাড়ার বাটীতেই কার্ত্তিকচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন।

ধনুলগ্নে বৃহস্পতিক্ষেত্রে কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্ম। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতা ও পিতামহ সমারোহে ৺ কার্ত্তিক পূজা করিতেন। অদ্যাবধি সেই পূজা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের পর, নবপ্রসূত সন্তানের সুন্দরাস্য দর্শন করিয়া জনক জননীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কৌলিক আচাব অনুসারে কুমারের কল্যাণার্থ সকল প্রকার অনুষ্ঠানই যথারীতি সমাহিত হইয়াছিল। সংসার স্বচ্ছল থাকায়, কার্ত্তিকচন্দ্র শৈশবেও অতি যত্নের সহিত লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী কিঞ্চিৎ স্থূলাবয়ববিশিষ্টা ছিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্রও শিশুকালে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দরমূর্ত্তি ছিলেন। দেহের কমনীয়তা ও স্থূলতা কার্ত্তিক-চন্দ্রের বরাবরই ছিল। ইদানিং কয়েক বৎসর হইতে বাতজ জ্বরের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার শরীরের শ্রী ও সৌষ্ঠব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক চন্দ্র গৌরবর্ণ না হইলেও, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, সুঠাম ও সুগঠিত। পূর্ণযৌবনে তিনি একটী দর্শনীয় সুপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন।

যাহা হউক শিশু কার্ত্তিক সকলেরই নিরতিশয় স্নেহের পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকের মনে গোপালভাবের উদয় হইত। হৃষ্টপুষ্ট, সুকোমল শরীরে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইত। সে মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই মনে হইত শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করি। কিন্তু কাৰ্ত্তিকচন্দ্রের জননী এরূপ স্নেহবিহ্বলা ছিলেন যে তিনি প্রায়ই পুত্রকে ক্রোড় হইতে নামাইতে চাহিতেন না। শিশু কার্ত্তিকের অর্দ্ধস্ফুট সুমধুর বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তিনি কেমন একপ্রকার মোহ প্রাপ্ত হইতেন। জগৎ ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, কেবল অনিমেষ নয়নে পুত্রের চাঁদমুখ দর্শন করিতেন আর তাহার বদন-নিঃসৃত বাক্যরূপ অমৃতধারা পান করিতেন। শিশু কার্ত্তিক যখন হামাগুড়ি দিয়া সবেগে প্রাঙ্গনে ধাবিত হইতেন তখন পুত্রবৎসলা জননী সত্য সত্যই নন্দরাণীর ন্যায় পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেন এবং সহসা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন।

পিতামহ ও জনক জননীর অত্যধিক স্নেহ ও আদর ভোগ করিতে করিতে ক্রমে কার্ত্তিকচন্দ্র পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলেন। বিদ্যাশিক্ষার কাল আগত দেখিয়া শুভদিনে ও শুভক্ষণে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইল। তৎকালে সুতরাগড়ে কোন বিদ্যালয় ছিল না। গ্রাম্য পাঠশালা কয়েকটী ছিল। সুতরাং তাহাকে দক্ষিণপাড়ার একটী পাঠশালায় প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে তিনি ৩।৪ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষার পর, ৯ বৎসর বয়সে কার্ত্তিকচন্দ্র সুতরাগড়ের নূতন বাটিতে স্থানান্তরিত হয়েন। এখানে আসিয়া তিনি আর পাঠশালায় লিখিতে পড়িতে যান নাই। কিছু দিবস শান্তিপুরস্থ "নিউস্কুল" নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে সুতরাগড় গ্রামে ১৮৭২ সালে মধ্যইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছু দিবস সেখানেও অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তিনি মধ্যইংরাজী পরীক্ষার জন্য আদৌ

প্রস্তুত হন নাই। কয়েক মাস মধ্যেই উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং শান্তিপুর হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল অধুনা "মিউনিসিপ্যাল স্কুল" নামে পরিচিত। ১৮৭৪ সালে স্থানীয় মিউনিসিপালিটি এই স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কার্ত্তিকচন্দ্র মিউনিসিপ্যাল স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজি ১৮৮০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী হন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর।

ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ১৮৭৪ সালে কার্ত্তিকচন্দ্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুতরাগড় নিবাসী ৺ দীননাথ ইন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী লুটুবালা দাসীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয়। এই পরিণয় কার্য্য, অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, সুতরাগড়ে সেরূপ জাঁক জমকের বিবাহ ইতঃপূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। বরকে সুসজ্জিত "তক্তারামা"য় করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার সরঞ্জামের মধ্যে একটী হস্তীও আনীত হইয়াছিল। লোকজনকে অতি উপাদেয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে ভোজন করান হইয়াছিল। তৎকালে খাদ্য দ্রব্যাদি অনেকটা শস্তা ছিল। মৎস্যের মণ ৫৲ টাকা মাত্র। একমণ পটোলের মূল্য ১৷০ মাত্র। সুতরাং দ্রব্যাদি কিছুই অপ্রতুল ছিল না। শুনা যায় এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতামহ ৺ দুর্ল্লভচন্দ্র দাস মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। এই বিবাহে অনেক ধুমধাম করিয়াও তাঁহার ৩০০০৲ মুদ্রার অধিক ব্যয় হয় নাই। পিতামহ দুর্ল্লভচন্দ্র কার্ত্তিকচন্দ্রকে চিরদিনই নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রতিদিন এক পোয়া মিষ্টান্ন জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। এই জলখাবারের খরচ দুর্ল্লভচন্দ্র স্বয়ং দিতেন। বলাবাহুল্য তখন কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র পৈতৃক ভবন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র শৈশব হইতে শিষ্ট শান্ত নিরীহ "ভাল মানুষ"। তিনি

কখন কাহারও সহিত কলহ বা বিবাদ করেন নাই। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। পিতৃগুণ অধিকাংশই লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পিতৃদোষ তাঁহাতে অল্পই দেখা যায়। সাধারণের হিতার্থ তিনি যেরূপ মুক্তহস্তে ৩৬০০০৲ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন তাঁহার বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

কার্ত্তিকচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কখন কুসঙ্গে মিশেন নাই। বস্তুতঃ বাল্যকালে এবং যৌবনের প্রারম্ভে তিনি বাটী হইতে অল্পই বহির্গত হইতেন এবং বহির্গত হইলেও অত্যল্প লোকের সহিতই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের কেহই "ইয়ার" ছিল না। সুতরাং কুসংসর্গজনিত দোষ তাঁহার চরিত্রকে আদৌ স্পর্শ করে নাই। কিন্তু কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেন না বলিয়া, কার্ত্তিকচন্দ্র আদৌ অভিমানী বা অহঙ্কারী নহেন। বস্তুতঃ আমি কার্ত্তিকচন্দ্রর ন্যায় নিরহঙ্কার লোক অল্পই দেখিয়াছি। প্রতিবাসী দিগের গৃহে তিনি যেখানে সেখানে দরিদ্রভাবে বসিয়া পড়েন; নিজের মান সম্ভ্রম বা অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা একবারও চিন্তা করেন না। বিলাসের সামগ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র আদৌ ব্যবহার করেন না। ভদ্রজনোচিত সামান্য বসন ভূষণেই তিনি পরিতৃপ্ত। আহারের দ্রব্যেও কার্ত্তিকচন্দ্রের কিছু মাত্র বিলাস নাই। বিলাসের মধ্যে কখন কখন মাংস আহার করিয়া থাকেন। পিতা মাণিকচন্দ্রও যৌবনে মাংস আহার করিতেন। কিন্তু একটী দৈব ঘটনায় তাঁহার মাংসত্যাগ হয়। একবার তিনি জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে দেবীর নিকট ছাগবলি দিয়া উহার মাংসভক্ষণে বাসনা করিয়াছিলেন। এতদর্থে একটী ছাগ ক্রয়ও করিয়াছিলেন। মাণিক চন্দ্র তখন দক্ষিণপাড়ার বাটীতে বাস করিতেন। "কৃষ্ণকালা" তলায় ৺জগদ্ধাত্রী দেবীর সম্মুখে তাঁহার ছাগবলি হওয়া স্থির ছিল। পূজার পূর্ব্বরাত্রিতে তিনি স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন—স্বয়ং দেবী তাঁহাকে

কহিতেছেন "তুমি ছাগবলি দিও না। দিলে তোমার অনিষ্ট হইবে।" স্বপ্ন দর্শন করিয়া মাণিকচন্দ্র ভীত হইলেন। সেই অবধি তিনি আর মাংস ভক্ষণ করেন নাই। তবে সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের ন্যায় মৎস্য ভোজন করিতেন। কার্ত্তিকচন্দ্র কিন্তু বাল্যাবধি মাংসভোজনে অভ্যস্ত এবং ভোজনার্থ মাংস উপস্থিত হইলে তিনি উহা ত্যাগ করেন না।

ইদানীং কার্ত্তিকচন্দ্রের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহার আহারাদির আর কোন পারিপাট্যই দেখা যায় না। মৎসের ঝোল ও যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ মাত্র তাঁহার আহারের প্রধান উপকরণ। চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তিনি কখন কখন নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পোর্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তিনি কোন মাদকদ্রব্য স্পর্শ করেন না।

প্রথম যৌবনেও কখন তাঁহার মাদক সেবনের অপবাদ ঘটে নাই। কার্ত্তিকচন্দ্র চিরদিন সচ্চরিত্র। কেহ কখন তাঁহার নামে ব্যভিচারাদির কলঙ্ক আরোপ করে নাই। ব্যভিচারের কথা দূরে থাকুক কার্ত্তিকচন্দ্র কখন পরস্ত্রীর প্রতি কুভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। যৌবন ও ধনসম্পত্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য লাভ করিয়াও তিনি যে চরিত্র হইতে স্খলিত হন নাই ইহা তাঁহার ন্যায় লোকের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। ফল কথা কার্ত্তিকচন্দ্র একজন অতি সরলপ্রকৃতি, বিনম্রস্বভাব, অমায়িক লোক। পিতার ন্যায় কার্ত্তিকচন্দ্রও অত্যন্ত সাধুভক্ত। সাধুগণের প্রভাব তাঁহার জীবনে কতদূর কার্য্য করিয়াছে আমরা পরে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। দেবদেবীর প্রতি কার্ত্তিকচন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস। জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সমস্যাস্থলে তিনি অনেকবার কাতরভাবে দেবদেবীর আদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ফলতঃ কার্ত্তিকচন্দ্রের ন্যায় সরল ও আশুবিশ্বাসী বিষয়ী লোক অল্পই দেখা যায়।

অনেকে মনে করেন সরল হইলেই বুঝি একটু নির্ব্বোধ হইতে হয় এবং আশুবিশ্বাসী ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করিবার বড়ই সুবিধা। এ সকল কথা অপরের পক্ষে সত্য হইলেও, কার্ত্তিকচন্দ্রের সম্বন্ধে আদৌ সত্য নহে। কার্ত্তিকচন্দ্র চতুর ও বিষয়ী লোকের পুত্র। চাতুর্য্য ও বিষয়বুদ্ধিতে তিনি তাঁহার ৺পিতা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। কিন্তু যে চাতুর্য্যবলে লোকে অপরের অনিষ্ট সাধন করে, কিম্বা অপরকে প্রতারণা করে সে চাতুর্য্য কার্ত্তিকচন্দ্রের আদৌ নাই। কার্ত্তিকচন্দ্রের চাতুর্য্য অপরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দোষহীন। তাঁহার চাতুর্য্য তাঁহাকে অপরের নিকট প্রতারিত হইতে দেয় না এই মাত্র। পিতৃধনের অপচয় করা দূরে থাকুক, কার্ত্তিকচন্দ্র স্বকীয় প্রতিভা ও বিষয়বুদ্ধিবলে উহার বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। এই বিষয়বৃদ্ধির মূল কলিকাতা বড় বাজারে ৮৯ নং বড়তলা ষ্ট্রীটে চিনির আড়তের প্রতিষ্ঠা। ১৩১৮ সালের ১লা বৈশাখ এই আড়ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ আড়তের কার্য্যাধ্যক্ষ গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ রক্ষিত। ইনি একজন অতি বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী। সম্প্রতি ১৩২১ সালের ২১শে ফাল্গুন কার্ত্তিকচন্দ্র কলিকাতা বেলগেছিয়ার আর একটী নূতন কারবার খুলিয়াছেন। এই কারবারেরও বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক বিষয়বুদ্ধির চতুরতা এবং আশুবিশ্বাসীর সারল্য একাধারে আমি কেবল কার্ত্তিকচন্দ্রের চরিত্রেই দর্শন করিতেছি। প্রথম যৌবন হইতেই কার্ত্তিকচন্দ্রের চরিত্রে এই সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কার্ত্তিকচন্দ্রের চরিত্রে আর একটী গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিঞ্চিৎ পরেই পাঠক দেখিতে পাইবেন কার্ত্তিকচন্দ্র পর পর তিনটী দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় কার্ত্তিকচন্দ্রের তিনটী স্ত্রীই বর্ত্তমান। অপরের পক্ষে দুই স্ত্রী এক গৃহে লইয়া সংসার করা সুকঠিন। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র

সমদৃষ্টি ও সমব্যবহারগুণে তিনটী সহধর্ম্মিণী লইয়াই সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতেছেন। বস্তুতঃ কার্ত্তিকচন্দ্রের সংসারে কলহ বিবাদ বা কোনরূপ অশান্তির কথা প্রায়ই শ্রুত হয় না। লক্ষ্মীর কৃপায় এইরূপই হইয়া থাকে। তাঁহার ভাগ্যবতী সকল স্ত্রীই সুশীলা ও পতিপরায়ণা। কার্ত্তিকচন্দ্রের পীড়িতাবস্থায় সকলেই স্বামীর রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। ফলতঃ সপত্নীগণের পরস্পরের মধ্যে অকপট সখ্য ও প্রেম অদ্যকার পৃথিবীতে নিরতিশয় প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতৃভক্ত পুত্র। পিতার জীবদ্দশায় তিনি প্রতিনিয়ত পিতৃদেবের পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিয়া নানাপ্রকার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। পিতার স্বর্গারোহণের পরও তিনি পিতৃদেবকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্মৃত হয়েন নাই। পিতার একখানি Photo বা ছায়ামূর্ত্তির নিম্নে তিনি একটী মর্ম্মস্পর্শিণী কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন। কবিতাটী পরিপাটী বা সুসংস্কৃত না হইলেও উহাতে কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রাণের আবেগ অতি সুন্দরভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল :—

পিতৃদেব! স্বর্গে তুমি, আসিবে না আর।
বড় দাগা দিয়া গেছ হৃদয়ে আমার॥
পাপী ব'লে স্থানান্তরে অযত্নে ফেলিয়া।
চিরতরে গেছ দেব! মোরে ফাঁকি দিয়া॥
অতল বিস্মৃতি-জলে তোমার মূরতি।
ভাসিছে স্মৃতির টানে আজও দিবারাতি॥
আজিও পুড়িছে হৃদি তোমার বিহনে।
মিনতি, অন্তিমে স্থান দিও শ্রীচরণে॥

কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতার পাষাণময় মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে। এই মূর্ত্তি "মাণিকচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের" সুপ্রশস্ত হল গৃহের দক্ষিণ দিকে সংস্থাপিত। এই মূর্ত্তির ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ হল গৃহের উত্তরভাগে কার্ত্তিকচন্দ্র নিজেরও একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জীবদ্দশায় এইরূপ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা লোকে বিসদৃশ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের সান্নিধ্য পিতাপুত্রের অচ্ছেদ্য স্নেহ-বন্ধনের পরিচায়ক মনে করিলেও করা যাইতে পারে। কার্ত্তিকচন্দ্র নিজমূর্ত্তির নিম্নস্থ প্রস্তরফলকে ইংরেজি ও বাঙ্গলায় কতকগুলি হৃদয়গ্রাহী বাক্য খোদিত করাইয়াছেন। ঐ বাক্যগুলি পাঠমাত্র কার্ত্তিকচন্দ্রকে বিবেকী ও সাধুহৃদয় বলিয়া বিশ্বাস হয়। ফলতঃ তাহাই হউক। কার্ত্তিকচন্দ্র প্রস্তরগাত্রে যে বিবেক ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়াছেন সংসার ক্ষেত্রেও সেই বিবেক ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়া জীবনকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করুন। আমি নিম্নে ঐ খোদিত বাক্যাবলী এবং তাহাদের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম ঃ—

হরি! হরি! কি মোর করম অভাগ!
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহল শেল
নাহি ভেল হরি অনুরাগ!

Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more.

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥

হে ভগবন্! আমি কি দুর্ভাগ্য। আমার জীবন বৃথা অতিবাহিত

হইল। হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়া রহিল। তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

এ জীবন চঞ্চল ছায়ামাত্র। হতভাগ্য জীব রঙ্গভূমির অভিনেতার ন্যায় সদর্পে পাদচারণা ও অভিমানাদি ব্যঞ্জক উচ্চরব করিতে করিতে কোথায় চলিয়া যায়, আর তাহার কোন বার্ত্তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

নাথ! আমি ত তোমার শ্রীচরণে অহর্নিশ সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি। কিন্তু হে মধুসূদন! আমাকে তোমার ক্রীতদাস মনে করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে। হে গোবিন্দ! তুমি ত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছ "আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হইবে না।" তাই নাথ! তোমার অভয় বাণীতে বুক বাঁধিয়া প্রাণধারণ করিয়া রহিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

গার্হস্থ্যজীবন ও বিষয়কার্য্য পরিদর্শন।

"গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

ইংরেজি ১৮৮০ সালে কার্ত্তিকচন্দ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। পিতা মাণিকচন্দ্রের প্রভূত ধনসম্পত্তি। কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নিকট থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম বুঝিতে লাগিলেন। মাণিকচন্দ্রের সুতরাগড় গ্রামে ও কোটচাঁদপুরে কয়েকটী চিনির কারখানা ছিল। চাঁদপুরের কারখানা প্রায়শঃ কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে পরিচালিত হইত। কার্ত্তিকচন্দ্র

বিষয়কর্ম্ম ব্যপদেশে প্রায় কখন চাঁদপুরে গমন করেন নাই। সুতরাগড়ের কারখানাতেও কর্ম্মচারী কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্র স্বয়ং ঐ কারখানার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার বৈষয়িকশিক্ষালাভ হইতে লাগিল। মাণিকচন্দ্রের তেজারতী কারবারও যথেষ্ট ছিল। কার্ত্তিকচন্দ্র তৎসম্পর্কে লোকের নিকট প্রাপ্য অর্থবুঝিয়া লইতে লাগিলেন। যে সকল স্থলে রাজদ্বারে অভিযোগ বিনা অর্থ আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে অভিযোগাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। অর্থবৃদ্ধির সহিত মাণিকচন্দ্র বহু টাকার কোম্পানির কাগজ এবং বিপুল আয়ের ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। এই সম্পর্কে কার্ত্তিকচন্দ্র বিষয়কার্য্যের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে শিক্ষা করিলেন। অধুনা তিনি নিজ বুদ্ধিবলে ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলতঃ কার্ত্তিকচন্দ্রকে একজন সুচতুর বিষয়ী লোক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বিষয়ী হইয়াও কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যয়কুণ্ঠ কিম্বা স্বার্থসর্ব্বস্ব নহেন। তাঁহাতে সদাশয়তা ও সহৃদয়তার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যথাস্থানে সে সকল বিবৃত হইবে।

কার্ত্তিকচন্দ্র এইরূপে যখন বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত আছেন সেই সময় তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় পিতা মাণিকচন্দ্র এবং জননী কেদারেশ্বরী দাসী অতিমাত্র চিন্তিত হইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী লুটুবালা দাসী দুইটী কন্যামাত্র প্রসব করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার দুই কন্যাই গতাসু হইয়াছে। কন্যা দুইটীর মধ্যে একটীর নাম ছিল নন্দরাণী দাসী ও অপরটীর নাম ছিল যশোদারাণী দাসী। সুতরাগড় নিবাসী ৺ দ্বারিকা নাথ সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন ও ৺ বিশ্বেশ্বর বিশ্বাসের পুত্র শ্রীযুক্ত তারাদাস বিশ্বাসের সহিত এই কন্যাদ্বয়ের যথাক্রমে বিবাহ হয়।

নন্দরাণীর দুইটী কন্যা হইয়াছিল। সৎপাত্রে ঐ কন্যাদ্বয়কে অর্পণ

করা হইয়াছে। এই কন্যাগণের সন্তানসন্ততি লইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী কন্যাশোক কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছেন। যাহাহউক শ্রীমতী লুটুবালা দাসীর গর্ভে পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া মাণিকচন্দ্র কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। একটী পাত্রীও উপস্থিত হইল। কার্ত্তিকচন্দ্র নিরীহ ভালমানুষ। এই বিবাহে পত্নী লুটুবালার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিবে তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। কিন্তু কি করিবেন, জনক জননীর আজ্ঞা, বিশেষতঃ বংশলোপের আশঙ্কা। অগত্যা পত্নীর সম্মতি ক্রমে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাগড় নিবাসী ৺ ব্রজনাথ নন্দীর কন্যা শ্রীমতী বিমলা দাসী কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী। ইনি যথাকালে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। কিন্তু সেই হতভাগ্যপুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পরে বিমলা দাসী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। একবার ইনি অত্যন্ত সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হন। জরায়ুকোষে অর্ব্বুদের (Tumour) সঞ্চার হইয়াছিল। সুনিপুণ ইউরোপীয় চিকিৎসক উপযুক্ত অস্ত্র সাহায্যে উদর কর্ত্তন করিয়া সেই অর্ব্বুদ আরোগ্য করেন। ইহাতে শ্রীমতী বিমলা দাসীর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা চিরকালের জন্য দূর হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে দুইবার বিবাহ করিয়াও কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্রলাভ হইল না। জনক জননীর দুঃখ ও ক্ষোভের পরিসীমা নাই। দিন দিন তাঁহাদের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কার্ত্তিকচন্দ্রও একটু বিষণ্ণ ও বিমনা হইলেন। অগত্যা তৃতীয় বিবাহের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ধনবান পুত্রের বিবাহ দিতে মাণিকচন্দ্রকে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হইল না। কলিকাতা নিবাসী ৺ হরিমোহন নন্দী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দাসীর সহিত কার্ত্তিকচন্দ্রের তৃতীয় পরিণয় সম্পন্ন হইল। এই বিবাহে ভগবদিচ্ছায় সুফল ফলিয়াছে। বাঙ্গলা ১৩১০ সালের ২রা কার্ত্তিক

এই পত্নীর গর্ভে কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পৌত্র-মুখ দর্শন করিয়া পিতা মাণিকচন্দ্র ও জননী কেদারেশ্বরী দাসী যে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। পুত্রের কল্যাণার্থ তৈলসন্দেশ বিতরণাদিতে যথেষ্ট ব্যয়ভূষণ হইয়াছিল। পুত্রটী অসাধারণ সৌন্দর্য্য লইয়া জন্মিয়াছিল। কিন্তু নিরতিশয় দুঃখের বিষয় কার্ত্তিকচন্দ্রের পুরুলিয়া প্রবাসকালে পুত্রটী ছয় বৎসর বয়সে বসন্ত-রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। সোণার সংসারে শোকের ছায়া পড়িল। কার্ত্তিকচন্দ্র পুত্রশোকাতুরা পত্নীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। মাণিকচন্দ্রের প্রসন্ন মুখ আবার বিষাদে আচ্ছন্ন হইল।

এই শোকাবহ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১২ সালের ১৮ই ভাদ্র শ্রীমতী সরোজিনী দাসী আর এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম শ্রীমান হরকালী দাস। পুত্রটীর পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীচন্দ্রপ্রসাদ দাস। এইনাম কার্ত্তিকচন্দ্র বা তাঁহার গুরুজনেরা ইচ্ছা করিয়া রাখেন নাই। কার্ত্তিকচন্দ্রের আদৌ পুত্রসন্তান না হওয়ায় ৺ কাশীক্ষেত্রে একটী কর্ম্মী ব্রাহ্মণ দ্বারা কিছু দৈবকার্য্য করা হয়। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াশেষ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে কহিলেন—"এক বৎসরের মধ্যেই আপনার পুত্রলাভ হইবে। কিন্তু উহার নাম রাখিতে হইবে শ্রীসূর্য্যপ্রসাদ। প্রথম পুত্রের জন্মের পর এক বৎসর পরেই আর একটী পুত্র জন্মিবে তাহার নাম রাখিবেন শ্রীচন্দ্রপ্রসাদ।" দ্বিতীয় পুত্রটীর শরীর কিছু রুগ্ন থাকায় ফরিদপুর নিবাসী কোন সাধক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বতন্ত্র কোন দৈবকার্য্য করা হয়। কার্য্যান্তে ব্রাহ্মণ "চন্দ্রপ্রসাদ" নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "হরকালী" নাম রক্ষা করেন। তদবধি দ্বিতীয় পুত্রটী শ্রীহরকালী দাস নামেই অভিহিত হইতেছেন। এই পুত্রের বয়স এক্ষণে দশ বৎসর। এই পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করুন ভগবানের নিকট সকলেরই এই প্রার্থনা।

শ্রীমান হরকালী দাস ও শ্রীমান সাধুসিদ্ধেশ্বর দাস

পরে ১৩১৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তৃতীয় ভার্য্যার গর্ভে কার্ত্তিকচন্দ্রের আর একটী পুত্রসন্তান লাভ হইয়াছে। এই পুত্রের জন্মের মূলে একটী সাধুর কৃপা বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান। এই সাধুর বিবরণ পরে লিখিত হইবে। কার্ত্তিকচন্দ্রের এই পুত্রটী বড়ই সুলক্ষণাক্রান্ত। ভগবৎ কৃপায় সে দীর্ঘজীবী হইয়া জাতির ও জন্মস্থানের গৌরব বৃদ্ধি করুক। কার্ত্তিকচন্দ্রের পুত্রগণের শিক্ষা দীক্ষা, সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ-জীবনের উপর গ্রামের ও মোদক-সমাজের অনেক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার জীবদ্দশায় প্রবাসে অধিক গমন করেন নাই। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কয়েকবার দেওঘর এবং একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইটোয়া নগরী গমন করিয়াছিলেন। পরে পুরুলিয়ায় সপরিবারে ৩ মাস কাল অবস্থিতি করেন। এই প্রবাসকালের স্মৃতি তাঁহার পক্ষে চিরদিন কষ্টকর রহিবে। পুরুলিয়া বাস কালেই তিনি প্রথম পুত্র সূর্য্যপ্রসাদকে কালের মুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এ কথা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কার্ত্তিকচন্দ্র ইংরেজি ১৮৯৬ সালে একবার দার্জ্জিলিঙ্ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব-লেখক তখন শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। কার্ত্তিকচন্দ্র যখন দার্জ্জিলিঙ্ যাত্রা করেন তখন জ্যৈষ্ঠমাস—ছাত্র ও শিক্ষকগণের গ্রীষ্মাবকাশ। সুতরাং প্রস্তাব—লেখকও কার্ত্তিকচন্দ্রকে সঙ্গী পাইয়া হিমালয় দর্শনে বহির্গত হইয়া-ছিলেন। উভয়ে একত্র "লাউইস্ জুবিলি স্যানিটরিয়মে" বাস করেন। জালাপাহাড়, অব্জারভেটরি, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোহর দৃশ্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া উভয়েই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। ৭ দিবস মাত্র হিমালয় ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া উভয়েই গৃহে প্রত্যাগত হন।

অধুনা ৺বারাণসী ও কলিকাতা উভয় স্থানেই কার্ত্তিকচন্দ্রের স্বতন্ত্র বাটী আছে। কার্য্যোপলক্ষে বা স্বাস্থ্যের অনুরোধে উভয় স্থানেই তিনি মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সামাজিক জীবন ও সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

"শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন দানেন পাণি র্ন চ কঙ্কণেন।
আভাতি কায়ঃ করুণাপরাণাং পরোপকারেণ ন চন্দনেন॥"

নীতিশতকং।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে কার্ত্তিকচন্দ্রের গার্হস্থ্যজীবনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে সমাজের ও সাধারণের সহিত কার্ত্তিকচন্দ্রের জীবনের কি সম্বন্ধ দেখিতে চেষ্টা করা যাউক। ইংরেজি ১৮৬৫-৬৬ সালে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সুত্রাগড় গ্রাম শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। ইংরেজি ১৮৮৪ সাল হইতে এই মিউনিসিপ্যালিটীতে কমিশনর বা প্রজাপ্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্র বরা-বরই গবর্ণমেণ্টের মনোনীত কমিসনর। ইংরেজি ১৮৮৭ সালে তিনি এই কমিশনরী পদ সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। সেই অবধি আজ প্রায়

২৫ বৎসর তিনি কমশনরী করিয়া আসিতেছেন। অধিকন্তু ইংরেজি ১৮৮৬ সালের ২০শে জুন হইতে তিনি শান্তিপুর বেঞ্চে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রূপেও কার্য্য করিতেছেন। এই দুই কার্য্যে তাঁহাকে সুতরাগড় ও শান্তিপুরের প্রজাসাধারণের সহিত নানাভাবে মিশিতে হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সরকারী কার্য্য করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে কখনও দুর্ণাম ভোগ করিতে হয় নাই।

ইংরেজি ১৯০৯ সালে কার্ত্তিকচন্দ্র "সুতরাগড় মহারাজা অব্ নদীয়াস্ হাই ইংলিস স্কুলের" সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ইহার সম্পাদকতাকালে উক্ত বিদ্যালয়গৃহ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। একটু দূর হইতে দেখিলে গৃহের দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর দেখায়। আশা করা যায় কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বারা ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টীর বহুতর মঙ্গল সাধিত হইবে।

সম্প্রতি কার্ত্তিকচন্দ্র দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গনভূমিতে একটী পুস্তকাগার নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠাকালে উহার নাম হইবে "কার্ত্তিকচন্দ্র সাধারণ পুস্তকাগার।" পুস্তকাগারের নিমিত্ত উপযুক্ত পুস্তকসকল সংগ্রহের ভারও প্রধানতঃ কার্ত্তিকচন্দ্রের। এই সুকীর্ত্তির জন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের নাম চিরদিন বিদ্বজ্জন-সমাজ সমাদৃত হইবে।

কেবল সুতরাগড়স্কুলের সহিত কার্ত্তিকচন্দ্রের সম্বন্ধ নহে। "শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের" কার্য্যকরী সমিতিরও তিনি একজন সভ্য। এই উভয় স্কুলেই তিনি দুই শত মুদ্রা করিয়া দান করিয়াছেন। এজন্য এই উভয় স্কুলেই তাঁহার নামে এক একটী বালক অবৈতনিক ছাত্ররূপে অধ্যয়ন করিতে পায়। শান্তিপুর স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ একটী ছাত্রকে কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নামে প্রতিবৎসর একটী রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত

কার্ত্তিকচন্দ্র স্বজাতীয় কোন কোন বালকের অধ্যয়নার্থ মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। কোন কোন দুঃস্থ ব্যক্তির ভরণপোষণের জন্যও কার্ত্তিক-চন্দ্র মাসিক কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

বাঙ্গলা ১৩১৫ সালে শান্তিপুরের মোদক-সমাজের হিতার্থ একটী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির প্রথম সূচনা আরও ১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩০৫ সালে। সুতরাগড় নিবাসী মোদকজাতীয় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস (ছোট কার্ত্তিক) শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাখাল দাস নন্দী, শ্রীযুক্ত সিদ্ধিগোপাল নন্দী, এবং পরলোকগত বিপ্রদাস প্রামাণিক প্রমুখ সহৃদয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় ও উৎসাহে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। ১৩১৫ সালে এই সমিতি নূতন আকারে গঠিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অশেষ প্রকারে মোদক জাতির কল্যাণসাধন করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। অধুনা এই সমিতির নাম "সুতরাগড় মোদক হিতৈষী সমাজ"। কার্ত্তিকচন্দ্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সমাজের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগরে যাইবার পথে বড়ই জলকষ্ট। দীগ-নগরের দীর্ঘিকা ব্যতীত প্রশস্ত জলাশয় এ পথে আর কুত্রাপি নাই। এজন্য ৺মাণিকচন্দ্র পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্রের অনুরোধে গোবিন্দপুর নামক স্থানে একটী পুষ্করিণী ক্রয় করিয়া উহার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে পথিকগণের জলকষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে।

কিন্তু কার্ত্তিকচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি সুতরাগড়ে দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপন। এই জনহিতকর অনুষ্ঠানের মূলে একটী উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে।

ইংরেজি ১৯০৩ সালে কার্ত্তিকচন্দ্রের দ্বিতীয়া ভার্য্যা শ্রীমতী বিমলা দাসী "অর্ব্বুদ" পীড়ার দুরারোগ্য যন্ত্রণায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট পান একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গ্রামে তাঁহার নানা

প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল। কিন্তু কোন চিকিৎসকই সুন্দররূপে রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং রোগীর রোগযন্ত্রণা নিবারিত হইল না। কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। শেষে পুরস্ত্রীগণের দুইজন দেওঘরে বাবা ৺বৈদ্যনাথের নিকট 'ধর্ণা' দিবার বাসনা করিলেন। বাসনা কার্য্যে পরিণত হইবার কোন অন্তরায় ছিল না। সুতরাং কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথম ও দ্বিতীয় ভার্য্যা উভয়কেই সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ গমন করিলেন। সেখানে উভয়েই ৺বাবার নিকট যথারীতি 'ধর্ণা' দিলেন। রাত্রিতে রোগীর প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল 'দুই শিশি লাল ঔষধ সেবন করিলেই তোমার যন্ত্রণা দূর হইবে।' স্বপ্নাদেশের কথা শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র পত্নীদ্বয়কে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীমতী বিধুমুখী বসু এম, বি, দ্বারা রোগিণীর যথারীতি রোগপরীক্ষা হইল। বসু মহোদয়া লক্ষণাদি দেখিয়া কহিলেন—'আমি দুই শিশি লাল ঔষধ দিতে পারি। কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, এই রোগ ঔষধে আরাম হইবার নহে। অস্ত্র চিকিৎসা ব্যতীত রোগিণীকে বাঁচান দুঃসাধ্য।" অতঃপর দুই শিশি লাল ঔষধ প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। শেষে কার্ত্তিকচন্দ্র রোগীকে ইডেন হাঁসপাতালে লইয়া যান। এই হাঁসপাতালের ত্রিতলগৃহে রোগীকে ক্লোরাফরম্ করিয়া উদরে অস্ত্রচালনা করা হয়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার পেক্ সাহেব এই অস্ত্র-চিকিৎসা করেন। শুনা যায় রোগীর জরায়ুর ভিতর টিউমর বা অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব উদর চিরিয়া সেই অর্ব্বুদ কর্ত্তন করেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায় একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এই সুকৌশলসম্পন্ন অস্ত্রচিকিৎসার পর কার্ত্তিকচন্দ্র কৃতজ্ঞতার

পরিচয় স্বরূপ ইডেন হাঁসপাতালে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করেন। সাহেবকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই হাঁসপাতালের এক্ষণে প্রধান অভাব কি?"—অধ্যক্ষ সাহেব ইহাতে উত্তর করিলেন—"আমাদের একটী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। তাহার মূল্য অন্যূন ৩০০৲ টাকা।" কাত্তিকচন্দ্র সাহ্লাদে তিনশত মুদ্রা সাহেবকে প্রদান করেন। সাহেব মুদ্রাপ্রাপ্তিমাত্র একজন কর্ম্মচারীকে ঐ যন্ত্র ক্রয় করিতে প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞাপন করিল—"৯০০৲ টাকার কমে ঐ যন্ত্র এখন পাওয়া যাইবে না।" তাহা শুনিয়া সাহেব নিজেই যে কোম্পানীর দোকানে ঐ যন্ত্র পাওয়া যায় তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেবকে স্বয়ং আগমন করিতে দেখিয়া আপণ-স্বামী সাধারণের হিতার্থ ঐ যন্ত্র সাহেবকে বিনামূল্যে প্রদান করিলেন। যাহাহউক এখন হইতে ইউরোপীয় অস্ত্র চিকিৎসার উপর কাত্তিকচন্দ্রের বড়ই শ্রদ্ধা হইল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে বহু লোকের অকালে প্রাণবিয়োগ হয়। অতএব বুঝিলেন যে জীবের দুঃখ—দূরীকরণার্থ চিকিৎসালয় স্থাপন করা সমর্থ ব্যক্তিগণের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাগড়ের বাটীতে পত্নীর সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পিতৃদেবের নিকট চিকিৎসার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সমস্ত বর্ণনা করিলেন। পিতা মাণিকচন্দ্র কহিলেন—"ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের অদ্ভুত ক্ষমতা বটে। ইঁহারা মৃত মনুষ্যকেও জীবনদান করিতে পারেন। অতঃপর কার্ত্তিকচন্দ্র পিতার নিকট একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাহাতে মাণিকচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"উহাতে কত ব্যয় হইবে?" কার্ত্তিকচন্দ্র উত্তর করিলেন—"অন্যূন ২৫০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে।" তচ্ছ্রবণে মাণিকচন্দ্র কহিলেন—"এখন নয়, আমার মৃত্যুর পর তোমার যাহা সাধ তাহা পূর্ণ করিও।

মাণিকচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়
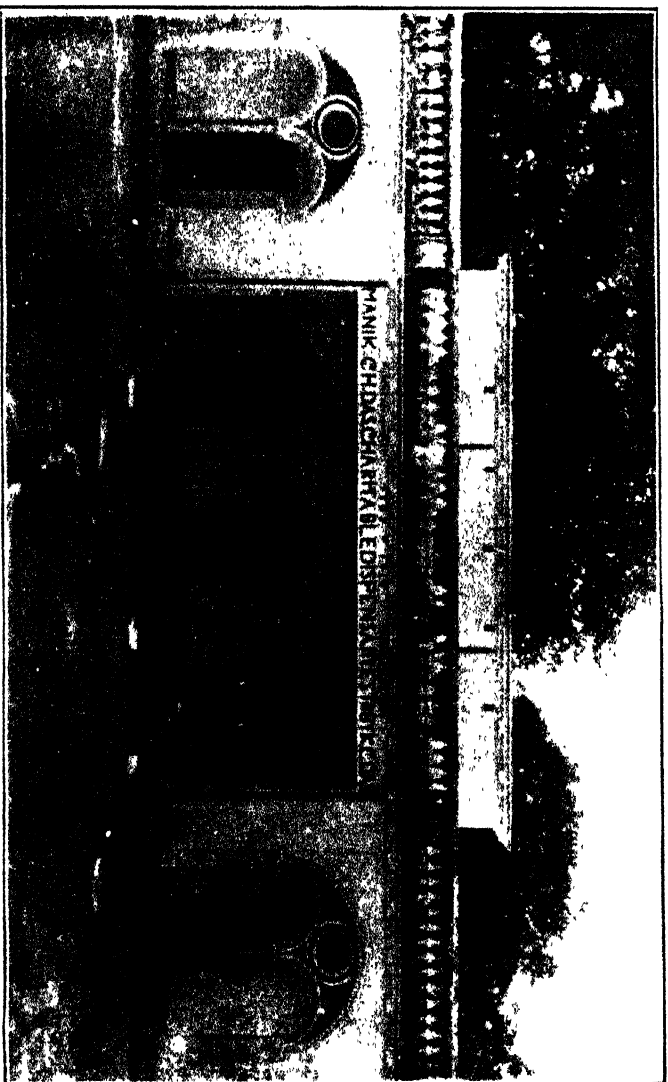
আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থের অত্যধিক মাত্রায় ব্যয় আমি সহ্য করিতে পারিব না।" ইহার কিছু দিবস পরে মাণিকচন্দ্র ৺বারাণসী ধামে গমন করেন। তথায় মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি দীনদুঃখীগণকে বনাত ও কম্বল বিতরণ করিতে থাকেন। কার্ত্তিকচন্দ্র তৎকালে শান্তিপুরের বাটীতে ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের শারীরিক অবস্থার কথা তারের দ্বারা কার্ত্তিক চন্দ্রকে জানান হয়। কার্ত্তিকচন্দ্র তার প্রাপ্তিমাত্র ৺বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন। বারাণসী পৌছিয়া তিনি জীবিত পিতাকে দর্শন করিতে পান। কিন্তু তখন মাণিকচন্দ্রের বাকৃশক্তি লোপ পাইয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

চিকিৎসালয়ের কথা কার্ত্তিকচন্দ্রের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ-বাসরেই ঐ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে সুতরাগড়ের কারখানা বাটীতেই এই চিকিৎসালয়ের সূচনা হয়। এই উপলক্ষে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট জে, এ, এজিকেল সাহেববাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসালয়ের নাম রাখা হইল—'মাণিকচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়।' পরে ইংরাজী ১৯১০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই চিকিৎসালয় কার্ত্তিকচন্দ্রের বসতি বাটীর সম্মুখস্থ নূতন গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিভাগীয় কমিশনর ই, ডবলিউ কলিন্ মহোদয়ের শুভাগমন করিবার কথা ছিল। কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ তিনি আগমন করিতে পারেন নাই। সুতরাং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরই এই নূতন চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বেশ ধুমধাম হইয়াছিল। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের অন্যূন ৩৬০০০৲ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

কার্ত্তিকচন্দ্রের জীবনের আর একটী স্মরণীয় কার্য্য ৺গণেশ মন্দির নির্ম্মাণ ও ৺গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। একটী মৌনী সাধুর উপদেশেই

এই গণেশদেবের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে কার্ত্তিকচন্দ্রের ৬০০০৲ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরভূমিতে একটি মৌনী সাধুর সমাগম হয়। ইহাকে সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও প্রেমপরিপ্লুতহৃদয় দেখা যাইত। সাধু দুই তিন দিবস অন্তর দুগ্ধ ও ফল মূলাদি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন কিন্তু কাহারও নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিতেন না। ভয়ঙ্কর শীতে ও প্রচণ্ড রৌদ্রেও তিনি অনাচ্ছাদিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। কখন কখন মস্তকের উপরে একটী ছত্র মাত্র দৃষ্ট হইত। সাধুর সঙ্গে হিন্দি ভাষায় লিখিত অনেকগুলি ভক্তিগ্রন্থ ছিল। দর্শকদিগের মধ্যে যাহারা হিন্দি পাঠ করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া হইত। সাধুর সর্ব্বভূতে এতাদৃশ প্রেম ছিল যে নিতান্ত হিংস্র জীবগণও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হইত না। এক দিবস সাধুব নিকট বালক বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ সাধুর নিকট বসিয়া তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় একাদশ ঘটিকা। সহসা সেই স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ সর্পশিশু দৃষ্ট হইল। সমাগত লোক সকল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সাধু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া লোক সকলকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"সর্প কাহারও হিংসা করিবে না। তোমরা কেহ উহার হিংসা করিও না।" বস্তুত তাহাই হইল। সাধু স্নেহভরে সর্পশিশুকে দুগ্ধ প্রদান করিলেন। সর্প সকলের সমক্ষে নির্ভয়ে দুগ্ধ পান করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ফলতঃ সাধুর বিশ্বজনীন প্রেমে শান্তিপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বহু ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সাধুর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রও সাধুদর্শনে
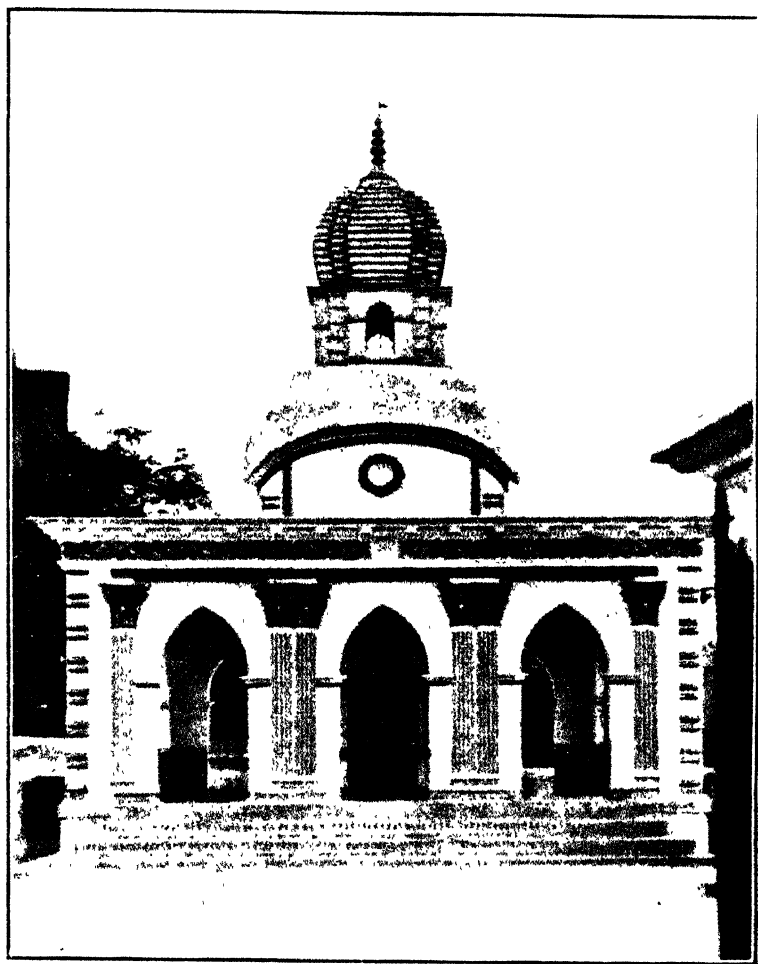
শ্রীশ্রীগণেশজীর মন্দির

গমন করেন। সাধুর চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে আপনার শারীরিক পীড়া ও অন্যান্য মনোবেদনার কথা জ্ঞাপন করেন। সাধু কথা কহিতেন না, কিন্তু ইঙ্গিত দ্বারা এবং পুস্তকাদির সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া, শারীরিক পীড়ার জন্য তিনি তাঁহাকে আহারাদির বিষয়ে কয়েকটী নিয়ম পালন করিতে আদেশ করিলেন। কার্ত্তিক-চন্দ্র কিছুদিবস ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। নিয়ম-পালনের ফলে তাঁহার শরীরও অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার নিয়মভঙ্গ হয়। নিয়মভঙ্গের পর কার্ত্তিক-চন্দ্রের শরীর পূর্ব্ববৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

নিয়মপালনের সঙ্গে সাধু কার্ত্তিকচন্দ্রকে একটী ৺গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। সাধুর আদেশে কার্ত্তিকচন্দ্র ৺কাশীধাম হইতে একটী শ্বেতপ্রস্তরময় সুন্দর গণেশমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া উঁহার যথারীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের বাসভবনের সম্মুখে সুদৃশ্য গণেশমন্দির শোভা পাইতেছে। গণেশদেবের নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি মাসের চতুর্থী তিথিতে বিশেষপূজার ব্যবস্থা আছে। প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর ৺গণেশদেবের মন্দিরে খোল করতাল সহযোগে সুমধুর হরিনামসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। এই কীর্ত্তিটী বজায় রাখিতে পারিলে, কার্ত্তিকচন্দ্র ভক্তজনমাত্রেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

সাধুর নিকট কার্ত্তিকচন্দ্র একটী সুসন্তান প্রার্থনা করেন। ইহাতে সাধু তাঁহাকে পুত্র সন্তানের বর দিয়া ইঙ্গিতে কহিলেন—"সন্তানের নাম ৺গণেশ বাচক কোন শব্দ রাখিতে হইবে।" যথাকালে শ্রীমতী সরোজিনী দাসী তৃতীয় পুত্র প্রসব করিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র সাধুর আদেশমত পুত্রের নাম রাখিলেন "সাধু সিদ্ধেশ্বর"। বলা বাহুল্য নামের প্রথমাংশ সাধুর স্মরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্রের এই পুত্রকে দেখিয়া

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় একজন প্রাচীন সাধুকে কহিতে শুনিয়াছি—"এই বালক কোন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ। ইঁহাকে দর্শন করিলে পুণ্য হয়। আমি বহুদিবস সাধন ভজন করিতেছি, তথাপি ইঁহার ন্যায় যোগ্যতা লাভ করিতে পারি নাই। এই বালকের দ্বারা এই বংশের ও গ্রামের নাম উজ্জ্বল হইবে।" বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্ত সাধুর প্রাগুক্ত বাক্যসকল সত্য করুন। ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতী সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোকে বহুকাল বাস করিয়া পরে সদাচারী ও শ্রীমান্ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের সৎকার্য্যে মতি দেখিলে গ্রামবাসী সকলেরই নিরতিশয় আনন্দ হইয়া থাকে। কিছুদিবস হইল ইঁনি প্রায় ৫০০৲ মুদ্রা ব্যয়ে শান্তিপুরে ও সুতরাগড়ে কয়েকটী জলের কল (Tube well) প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। পিতার পরলোক গমনের পর কার্ত্তিকচন্দ্র কয়েক বৎসর ধরিয়া সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই পূজায় তাঁহার পিতার সময় যে ব্যয় হইত তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় হইতেছে। সুতরাং কার্ত্তিকচন্দ্রের সুনামও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইংরাজি ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী নগরীতে রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের যে অভিষেকোৎসব হয় তদুপলক্ষে মহামান্য সম্রাটের নামে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর একটা প্রকাশ্য সভায় কার্ত্তিকচন্দ্রকে দাতব্য চিকিৎসালয়প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য্যের জন্য বঙ্গের ছোট লাট বাহাদুরের স্বাক্ষরিত একখানি Certificate of Honour অর্থাৎ সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

কালমাহাত্ম্য ও পার্থিবঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা।

ভূতগ্রাম স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আমি কার্ত্তিকচন্দ্রের জীবনী এইখানে পরিসমাপ্ত করিলাম। এই জীবন-কাহিনী নিতান্ত সংক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগবান্ করুন তাঁহার জীবনকাল সুদীর্ঘ হউক এবং ভাবী লেখকেরা কীর্ত্তিমান্ কার্ত্তিকচন্দ্রের জীবনকথা সুষ্ঠুতররূপে এবং অধিকতর বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হউন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ-চ্ছলে জীবসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন—

যদ্ যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং॥

যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও প্রভাবশালী সেই সেই প্রাণীই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে।

অতএব আর কিছুর জন্য না হইলেও কেবল ঐশ্বর্য্যের জন্যও কার্ত্তিকচন্দ্র আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদিত হয়। কোন ব্যক্তি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে লোকে তাঁহাকে সাধারণতঃ ভাগ্যবান্ বলিয়া থাকে। ইহার হেতু কি? অর্থ যে অনর্থের হেতু তাহা ত সকলেই জানেন। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন—

অর্থানামর্জ্জনে দুঃখং তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনং ॥

অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ। অর্থপরিরক্ষণে দুঃখ। অর্থের নাশে দুঃখ। ব্যয়ে দুঃখ। অতএব দুঃখভাজন অর্থকে ধিক্।

বিশেষতঃ এ কথাও নিতান্ত সত্য যে—

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।
সর্ব্ব ত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥

অর্থবান্ ব্যক্তিদের পুত্রাদি হইতেও ভয়। এ নীতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।

বস্তুতঃ অর্থ লইয়া সংসারে পিতা-পুত্রে, স্বামীতে-স্ত্রীতে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় প্রতিনিয়ত কলহ বিবাদ চলিতেছে। অনেক সময় এই সকল বিবাদ বিসংবাদের ফলও যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইয়া থাকে। অতএব লোকে অর্থ লইয়া ভাগ্যবান্ কিসে? ভাগ্যবান্ এইজন্য যে অর্থবান্ লোকেরা ইচ্ছা করিলে অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা বিপুল পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারেন। নির্ধন ব্যক্তির দান করিবার শক্তি কোথায়? জীর্ণ শীর্ণ, অনাহারক্লিষ্ট, দীন দুঃখীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় সত্য, কিন্তু এতাদৃশ জনের দুঃখ দূর করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? পতিপুত্রবিহীনা, নিরাশ্রয়া, বিধবার দুঃখ কষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদে বটে, কিন্তু সেই দুঃখিনীর অশ্রুমোচন করিবার সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? দরিদ্র, নিরক্ষর, অজ্ঞ বালকদিগের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হয়েন সত্য, কিন্তু উহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার যোগ্যতা তাঁহার কোথায়? ফলতঃ নির্ধন ব্যক্তির অপরকে অর্থসাহায্য করিবার ভাগ্য আদৌ নাই। নির্ধন ব্যক্তির সদুপদেশ ও সুপরামর্শও লোকের নিকট সমাদৃত হয় না। সুতরাং জগতের দুঃখ দেখিয়া জগৎস্বামীর নিকট নীরবে অশ্রু-মোচন ব্যতীত তাঁহার ভাগ্যে আর অধিক কিছু ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু যিনি ধনবান্ তিনি ইচ্ছা করিলে বিবিধ উপায়ে দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তির

দুঃখ ও বিপদ দূর করিতে পারেন। এইজন্যই ধনবান্ লোকেরা ভাগ্যবান্। জীবের দুঃখ দূরীকরণার্থই ভগবান্ ধনীকে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই সংসারে কয়জন ধনী তাহা বুঝিয়া থাকেন? কয়জন ধনীর দ্বারা অর্থের সদ্ব্যয় হইয়া থাকে? ভগবৎপ্রসাদে যাঁহারা ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনুক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে ধনের উপার্জ্জন ও সঞ্চয় অপেক্ষা ধনের সদ্ব্যয়েই অধিকতর মাহাত্ম্য। মনে রাখা উচিত **ধন কখন চিরস্থায়ী নহে।** এ পর্য্যন্ত জগতে অনেক ধনী বাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে কাহারও ধন বা ঐশ্বর্য্য স্থায়ী হয় নাই। তুমি আমি ত সামান্য মনুষ্য। যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই আপনাদিগকে মহাভাগ্যবান্ মনে করিয়া থাকি এবং ঐ ঐশ্বর্য্যকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য নানারূপ বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করি। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সুচতুর সর্ব্বনিয়ন্তার উপর কে কৌশল প্রয়োগ করিবে? বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে ধনেরও যথাকালে পক্ষ সঞ্জাত হয় এবং বিমানবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় ধনরাশিও সহসা একস্থান হইতে অপর স্থানে উড়িয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা সত্যই বলিয়াছেন—

মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বামিনং সুতবৎসলং॥

দুশ্চরিত্রা স্ত্রী যেমন সুতবৎসল স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে হাস্য করে, মৃত্যুও তদ্রূপ শরীররক্ষা বিষয়ে যত্নশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া উপহাস করেন এবং বসুন্ধরাও রাজন্যবর্গকে দেখিয়া হাস্য করেন।

ফলতঃ এই নশ্বর জগতে কাহারও ধনসম্পত্তি চিরস্থায়ী হয় নাই। অপরের কথা দূরে থাক, যে সকল ভুবনবিজয়ী, বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে বাস করিয়া ইহাকে ধন্যা করিয়া গিয়াছেন আজ তাঁহাদেরই বা ধন ঐশ্বর্য্য কোথায়?

অবিক্ষিত-তনয় মহাযাজ্ঞিক মহারাজ মরুত্ত যিনি সম্বর্ত্ত যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এরূপ ভূরি পরিমিত সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই সেই মরুত্তের ঐশ্বর্য্য আজ কোথায়? উশীর-তনয় মহারাজ শিবি যাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালীন গোদান সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং মহোদধির যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু" তিনি ব্রাহ্মণগণকে ততগুলি গাভীদান করিয়াছিলেন, সেই শিবির ঐশ্বর্য্য আজ কোথায়? মহারাজ মান্ধাতা যাঁহার সাম্রাজ্য সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমনস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যে মহাবীর অর্ণব-মেখলা, বসুপূর্ণা, বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বকীয় যশঃ প্রভাবে দশদিক্ পূর্ণ করিয়াছিলেন সেই মান্ধাতার ঐশ্বর্য্যই বা আজ কোথায়? "শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চাতুর্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম এবং অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের" অনুষ্ঠাতা নহুষ-তনয় মহারাজ যযাতির ঐশ্বর্য্যই বা আজ কোথায়? সঙ্কৃতিতনয় মহাত্মা রন্তিদেব যাঁহার ভবনে দুইলক্ষ পাচক সমাগতঅতিথিব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ক ও অপক্ক খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত সেই রন্তিদেবের ঐশ্বর্য্যই বা আজ কোথায়? * ফলতঃ ঐ সকল মহাপুরুষের নামমাত্র বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্রও আর এ জগতে দৃষ্ট হয় না।

তাহার পর যদুপতির প্রাচীন দ্বারকা বা মথুরাপুরী আজ কোথায়? রঘুপতির সুসমৃদ্ধ উত্তরকোশল রাজ্যই বা আজ কোথায়? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ আজ কোথায়? এসিরিয়া, মিডিয়া, কার্থেজ্ প্রভৃতি প্রাচীন জনপদসমূহই বা আজ কোথায়? অধিক

* মরুত্তাদি মহাপুরুষগণের বৃত্তান্ত মহাভারতীয় "দ্রোণপর্ব্ব" হইতে সংগৃহীত হইল।

কথা কি এই বঙ্গদেশের এককালের সর্ব্বপ্রধান বন্দর সপ্তগ্রামের আজ কি দশা? সুদৃশ্য সৌধমালায় পরিশোভিতা অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী সেই গৌরবময়ী মহানগরী গৌড়েরই বা আজ কি দশা? আর কত কথা বলিব? লিডিয়ার অধিপতি ধনকুবের ক্রীসস্ এবং বিশ্ববিজয়ী মহাবীর এলেক্জেণ্ডার বা জুলিয়স্ সীজরের ঐশ্বর্য্য সমূহই আজ কোথায়? এসিরিয়ার ঐশ্বর্য্যময়ী রাজ্ঞী সেমিরেমিস্, পাল্মীরার মহারাণী প্রতিভা-শালিনী জেনোবিয়া, এবং প্রাচীন মিসরের অধিশ্বরী বিলাসবতী ক্লিওপেট্রা ইঁহাদেরই বা বিলাস ও ঐশ্বর্য্যসমূহ আজ কোথায়? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন—

অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

অষ্টকুলাচল, সপ্তসমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, রুদ্রগণ, তুমি, আমি, এই পৃথিবী কিছুই থাকিবে না। অতএব কিসের জন্য শোক, বল?

ফলকথা, কালে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও লোপ পাইবে। কালের প্রভাবে কিছুই স্থির নহে। আজ যেখানে মহাসমৃদ্ধ জনপদ দেখিতেছি, কল্য সেখানে ভাষণ অরণ্যানী হইতে পারে। আজ যেখানে কল্লোলময় মহাসমুদ্র, কল্য সেখানে ভয়াবহ মরুভূমির আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে। তাই বিধাতার বৈচিত্রময়ী লীলা দেখিয়া ভক্তকবি ভক্তিভরে গাহিয়াছেন—

অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলীলবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাম্।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলা দুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

যাঁহার ইচ্ছায় বারিধি ভূভাগে পরিণত হয়, ভূভাগ জলভাগে পরিণত হয়, ধূলিকণা শৈলে পরিণত হয়, শৈল মৃৎকণায় পরিণত হয়, তৃণ বজ্রের কাঠিণ্য ধারণ করে, বজ্র তৃণের ন্যায় ক্ষীণ হয়, বহ্নি শীতলতা প্রাপ্ত হয় এবং হিম হইতে তাপের উৎপত্তি হয়, সেই লীলারহস্যময়, অদ্ভুতকর্ম্মা, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার।

ফলকথা জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তাই না জ্ঞানীরা বলেন—

চলচ্চিত্তং চলংবিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তিযস্য স জীবতি॥

চিত্ত চঞ্চল; বিত্ত চঞ্চল; জীবন ও যৌবন চঞ্চল। সংসারের সকলই চঞ্চল। একমাত্র কীর্ত্তিশালী লোকই জীবিত থাকে।

তবেই দেখা যাইতেছে একমাত্র কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী। কীর্ত্তি ব্যতীত সংসারে আর কিছুই থাকে না। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরকে কে দর্শন করিয়াছে? ব্যাস বা বাল্মীকিকে কে দেখিয়াছে? কালিদাস বা ভবভূতিকে কে দর্শন করিয়াছে? সেদিনকার সেক্ষপীয়র বা মিল্টনকেই বা কে দেখিয়াছে? প্রাগুক্ত মহাপুরুষসকল কতদিন হইল ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; অধুনা কেবল তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহাদের কীর্ত্তিই কেবল তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। কীর্ত্তি না থাকিলে এতদিন তাঁহারা বিস্মৃতির অগাধ জলধিতলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। অতএব দেখা যাইতেছে কীর্ত্তিমাত্রই চিরস্থায়ী। যে ধন বা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কীর্ত্তিরক্ষা না হইল তাহার সার্থকতা কোথায়? এই সকল বিষয় গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তির কীর্ত্তিমান্ হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়।

সুতরাগড় শান্তিপুরের বিভিন্ন বংশীয় মোদকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা॥

সুতরাগড়ে নিম্নলিখিত উপাধিধারী মোদকগণ বাস করিয়া থাকেন:—

আস, দাস, নন্দী, প্রামাণিক, সেন, দে, বিশ্বাস, ইন্দ্র, নাগ, রক্ষিত ও লাহা। ইহাদের বংশতালিকা যতদূর পাওয়া গিয়াছে পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।

'আস' বংশীয় মোদকগণের মধ্যে ৺ রামগতি আস মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইনি লেখাপড়া না জানিলেও সরলপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। যৌবনকালে ইহার সাহস ও বলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইনি বিলক্ষণ ভোজনপটু ছিলেন। ভোজের নিমন্ত্রণে যাইয়া ইনি ১ পণ মৎস্য ও এক তবক পায়সান্ন অনায়াসে ভোজন করিতে পারিতেন। ইহার কবির গান অনেক জানা ছিল। ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামগোপাল আস ১৮৮২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজে এফ এ পাঠ করেন। কিন্তু ইহার এফ এ পরীক্ষা আদৌ দেওয়া হয় নাই। কয়েক বৎসর শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া ইনি অধুনা চিনির কারবারে ব্যাপৃত আছেন। সাধারণের শিক্ষা বিষয়ে ইহার যথেষ্ট উৎসাহ আছে। রামগোপাল বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র

শ্রীমান রসময় আস এই বৎসর ম্যাটিকিউলেসন্ পীরক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

‘দাস’ বংশীয়দিগের কিছু কিছু পরিচয় কার্ত্তিকচন্দ্রের জীবনী প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বংশের মধ্যে ৺ রামহরি দাসের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি আড়তদার মোদকগণের মধ্যে অন্যতম। ইনি গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও সুপুরুষ ছিলেন। লোকে এই জন্য ইহাকে ‘সাহেব’ বলিত। ইঁহার ভদ্রাসন বাটীকেও লোকে “সাহেব বাটী” বলিত। অনেক সময়ে ইনি কলিকাতার আড়তে থাকিয়া বিষয়কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন। ইঁহার পুত্র ৺মথুরামোহন দাসও গৌরবর্ণ, স্থূলকায় ও সুশ্রী ছিলেন। স্বজাতীয়গণ মধ্যে ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও স্পষ্টবক্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মথুরামোহন অত্যন্ত ভোজনপটু ছিলেন এবং সর্ব্বদাই সুভোজনের ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, এই মথুরামোহন দাসেরই দ্বিতীয় পুত্র।

‘দাস’ বংশীয় ৺রামকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্র দাস ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

‘দাস’ বংশীয় ৺ঘনশ্যাম দাস ময়মনসিংহ নগরে মিষ্টান্নের দোকান করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি কয়েক বৎসর দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস পিতৃব্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। আশু-বাবুর পিতা ৺রাজকৃষ্ণ দাস একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা কয়েক পুরুষ হইতে শান্তিপুরের “লক্ষ্মীতলা” পল্লীতে বাস করিতেছেন।

‘দাস’ বংশীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাস নামক যুবকের বিষয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী শ্রীমতী কেদারেশ্বরী দাসী দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছেন। এই

যুবাকে কার্ত্তিকচন্দ্রের জননী অদ্যাপি পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া থাকেন। কার্ত্তিকচন্দ্রও ক্ষিতীশচন্দ্রকে সহোদর তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। ক্ষিতীশচন্দ্র কাৰ্ত্তিকচন্দ্রের জ্ঞাতি ৺ মতিলাল দাসের পুত্র। এই যুবা ৺ মাণিকচন্দ্রের দ্বারা বিষয়কার্য্যবিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যুবাটী বুদ্ধিমান্ ও সূক্ষ্মদর্শী। বিশেষতঃ মিষ্টভাষী, শান্তপ্রকৃতি এবং সত্ত্বগুণান্বিত। কার্ত্তিকচন্দ্রের সংসারকে ক্ষিতীশ-চন্দ্র আপন সংসার বলিয়াই মনে করেন। বস্তুতঃ ক্ষিতীশচন্দ্রের স্ত্রী ও সন্তানাদির সমস্ত ব্যয় কার্ত্তিকচন্দ্রের সংসার হইতেই হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহারও বন্দোবস্ত আছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ শ্যামাচরণ দাস "হরিপুর মডেল স্কুল" হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি বৎসর গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণের পুত্র শ্রীমান নলিনীমোহন দাস বিগত ম্যাট্রিকিউলেসন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সুতরাগড়ের 'দাস' বংশের অপর একটী শাখা ফরাসডাঙ্গা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। এই বংশের মধ্যে শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুতরাগড়ের 'নন্দী'বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের ৺ মহাদেব নন্দী একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি আড়তদার মোদকগণের মধ্যে অন্যতম। ইঁহারই পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় ৺ গোপীচরণ নন্দী মহাশয়ের নাম পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গোপীচরণ বাবু একজন সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন। ৺ মহাদেব নন্দী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ মাধবচন্দ্র নন্দী মোদকজাতীয়গণের মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। মাধব নন্দী মহাশয়ের পুত্র ৺ আশুতোষ নন্দী ও তদীয় সহোদরা স্বর্গীয়া মন্দাকিনী দাসীর ন্যায় সুশ্রী পুরুষ ও সুন্দরী নারী অধুনা মোদকজাতীর মধ্যে আর দৃষ্ট হয় না। ৺ মহেশচন্দ্র নন্দীও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি

আড়তদার মোদকগণের মধ্যে অন্যতম। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দীর পুত্র ৺রাধাকান্ত নন্দী এই বৎসর ইন্‌টার মিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। সম্প্রতি দুর্ব্বহ অভিমানভরে ইনি অকস্মাৎ আত্মহত্যা করিয়া দশমবর্ষীয়া বালিকাপত্নী ও আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। 'নন্দী'বংশীয় শ্রীযুক্ত সনাতন নন্দী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিনির কারবার করিতেছেন। ইনি কোটচাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন। সম্প্রতি উক্ত মিউনিসিপালিটীর কমিশনর আছেন। 'নন্দী' বংশীয় শ্রীমান বিষ্ণুপদ নন্দী ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্নগরে বাস করিতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মোদকগণের মধ্যে 'দাস' বা 'বরা' উপাধি-ধারী ব্যক্তিরাই কালক্রমে 'প্রামাণিক' নামে পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাগড়ের প্রামাণিকেরা সকলেই 'বরা'। কলিকাতার প্রামাণিক দিগের মধ্যে অনেকে 'দাস'। সুতরাগড়ের প্রামাণিকগণের মধ্যে ৺অক্রুরচন্দ্র প্রামাণিক ও ৺চাঁদমোহন প্রামাণিকের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শতাধিক বৎসর গত হইল সুতরাগড়ের মোদকেরা সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বগ্রামে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দেবের দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই কালে রঘুনাথ দেবের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটীও নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি দেবতার পূজার যথারীতি বন্দোবস্ত আছে। পূর্ব্বে রঘুনাথ দেবের সুবৃহৎ রথ ছিল। এই রথ নূতন বাজারের "সরিবৎ পুষ্করিণী"র পার্শ্বস্থ প্রশস্ত পথ দিয়া দক্ষিণ পাড়ায় টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। পরে 'চড়কতলা' হইতে ষড়ভুজের বাজার পর্য্যন্তও বহু দিবস রথ টানা হইয়াছিল। অধুনা এই রথ নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এই রথপর্ব্বোপলক্ষে সুতরাগড়ে বিশেষ ধূমধাম ছিল। অক্রূরচন্দ্র প্রামাণিকের বাটীতে রঘুনাথ দেবের গুণ্ডিচাগৃহ হইত। গুণ্ডিচার কয়েক দিবস ব্রাহ্মণভোজন ও

কীর্ত্তনাদির যথেষ্ট ধূম ছিল। বড়ই দুঃখের কথা অধুনা শ্রীশ্রীরঘুনাথ দেবের আর পূর্ব্ববৎ সেবা চলিতেছে না। শ্রীরামনবমী ও রথের কয়েক দিবস ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কোন উৎসবই নাই, অথচ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে প্রত্যেক মোদকপরিবার ৺রঘুনাথের যথারীতি বৃত্তি প্রদান করিতে বাধ্য। এ বিষয়ে বুদ্ধিমান মোদকগণের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি প্রার্থনীয়। ৺ অক্রূরচন্দ্র প্রামাণিকের ভিঠায় অদ্যাপি তাঁহার দৌহিত্রপরিবার ৺মহেশচন্দ্র ইন্দ্রের বংশধরেরা বাস করিতেছেন। ৺চাঁদ-মোহন প্রামাণিকও একজন সৎক্রিয়াশালী ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৪০ সালে তিনি একটী শিবমূর্ত্তি ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ শিবলিঙ্গ ও মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান। কিন্তু চাঁদমোহন প্রামাণিকের বংশলোপ হওয়ায় কিছু কাল হইতে ঠাকুরের পূজা এককালে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাগড়স্থ মোদকসাধারণের, বিশেষতঃ 'প্রামাণিক' বংশীয়গণের এ বিষয়ে দৃষ্টি করা আবশ্যক।

'প্রামাণিক' বংশের মধ্যে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিকের পিতা ৺মাধবচন্দ্র প্রামাণিকেরও কয়েকটী সদনুষ্ঠানের কথা শুনা যায়। তিনি তাঁহার দীক্ষাগুরু শান্তিপুরের বাঁশবুনে গোস্বামীদিগকে একটী ইন্দাবা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। 'প্রামাণিক' বংশীয় শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর প্রামাণিক ইংবেজি ১৮৯২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। 'প্রামাণিক' বংশীয় শ্রীগোপাল-চন্দ্র প্রামাণিকের পুত্র শ্রীমান আশুতোষ প্রামাণিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী ডাক বিভাগে চাকুরী করিতেছেন। 'প্রামাণিক' বংশের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক কোটচাঁদপুর মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনর আছেন।

সুতরাগড়ে 'সেন' বংশীয় মোদকগণের দুইটী শাখা দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উভয় শাখারই পূর্ব্বপুরুষ এক। সেনবংশীয় পূর্ব্বোল্লিখিত

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশরদিন্দু সেন "ডিব্রুগড় বেলিহোয়াটট মেডিকেল স্কুলে"র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধুনা ব্রহ্মপ্রদেশে গবর্ণমেণ্টের অধীনে "সব এসিষ্ট্যাণ্ট সরজনে"র কার্য্য করিতেছেন। ইঁহারই সহোদর শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সেন এম এ, বি, এল, ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাগীরথীর অপর পারস্থিত 'গুপ্তপল্লী' ও 'সাতগাছিয়া'র নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। এই 'সেন' বংশীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় সেন নামক একটী যুবক প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া মোক্তারী পরীক্ষা দেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি উচ্চবিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মোক্তারী না করিয়া অধুনা কলিকাতার কোন অফিসে চাকুরী করিতেছেন। ইঁহার প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অতুলচন্দ্র সেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সওদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেছেন। দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান নকুলচন্দ্র সেন গত বৎসর ইণ্টারমেডিয়েট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পাঠ করিতেছেন।

সুতরাগড়ের 'সেন' বংশীয় অপর এক শাখার মোদকগণের মধ্যে ৺ভরতচন্দ্র সেন ও ৺ভাগবতচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা উভয়েই ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ছিলেন। ৺ভাগবতচন্দ্র সেনের পুত্র ৺দ্বারকানাথ সেনও একজন অতি মিষ্টভাষী, সত্যব্রত ও শান্তপ্রকৃতি লোক ছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বিশ্বাসবংশীয়েরা কিছুকাল পূর্ব্বে 'দে' উপাধিধারী ছিলেন। 'বিশ্বাস' বংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ৺বদনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি রথ, দোল ও দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া সকল সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার অনেক সাত্ত্বিক দানের কথাও শুনা যায়। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস মহাশয় সুতরাগড় ইংরেজি বিদ্যালয়ের একজন প্রধান উদ্যোগী ও প্রতিষ্ঠাতা।

ইনি গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এই পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান। ৺বিশ্বেশ্বর বিশ্বাসের পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বিশ্বাস মহাশয় অনেক দিবস শান্তিপুর মিউনিসিপালিটির কমিশনর এবং স্থানীয় ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই বংশের শ্রীমান হরিদাস বিশ্বাস ও ৺শিবদাস বিশ্বাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমান হরিদাস বিশ্বাসের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান দ্বিজদাস বিশ্বাস কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিল্পশিক্ষার্থ জাপান গমন করিয়াছিলেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া ইনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরেজি ১৯১৩ সালে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

'দে' বা বিশ্বাসবংশীয়গণের মধ্যে ৺গোবর্দ্ধন 'দে'র নামও প্রসিদ্ধ। ইনি আড়তদার মোদকদিগের মধ্যে অন্যতম। দে-বংশীয় ৺মহাভারত দে ও শ্রীযুক্ত সনাতন বিশ্বাস এক সময়ে বেশ ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দে-বংশীয় ৺কুঞ্জবিহারী দে সুসভ্য ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 'বিশ্বাস' বংশীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাধাকান্ত বিশ্বাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চাকুরী করিতেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয়পুত্র শ্রীমান রতিকান্ত বিশ্বাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

'ইন্দ্র'বংশীয় মোদকগণের মধ্যে ৺মাধবচন্দ্র ইন্দ্র মহাশয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সরল, ধর্ম্মপ্রাণ ও সত্ত্বগুণান্বিত ছিলেন। মাধবচন্দ্র অনেকবার সমারোহে দুর্গোৎসবাদি পর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র ৺শুকদেব ইন্দ্র সঙ্গীতাদি নানা বিদ্যা কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে ইহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং ক্ষিপ্তাবস্থাতেই ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ৺মাধব ইন্দ্র মহাশয়ের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। খাজানা আদায়ের জন্য তাঁহার বাটীতে পুণ্যাহ হইত। প্রজারা সর্ব্বদাই বাটীতে গতায়াত করিত। বিশেষতঃ তাঁহার সহোদর ৺শ্রীরামচন্দ্র

ইন্দ্র মহাশয় পুলিসের দারগা ও মহকুমার ডেপুটী, সবডেপুটী প্রভৃতি রাজপুরুষগণের সহিত নানা সূত্রে মিশিতেন। গ্রাম্য অনেক মামলা মকদ্দমার নিষ্পত্তিও ইঁহাদিগকে করিয়া দিতে হইত। এই এই সকল কারণে ৺মাধব ইন্দ্র মহাশয়ের বাটীকে লোকে "হাকিম বাটী" বলিত।

এই 'ইন্দ্র'বংশীয় ৺চাঁদমোহন ইন্দ্রের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি অত্যন্ত সৎক্রিয়াশালী ব্যক্তি ছিলেন। রথ, দোল, দুর্গোৎসবাদি পর্ব্ব তিনি সমারোহে সম্পন্ন করিয়ছিলেন। ইঁহারা নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাটের নিকটবর্ত্তী 'লোনাগঞ্জ' নামক স্থান হইতে এখানে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র ৺দীননাথ ইন্দ্র মহাশয় আড়তদার মোদক-গণের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার পুত্রদ্বয় ৺সনাতন ইন্দ্র ও ৺মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্র পিতার জীবদ্দশায় ও তাঁহার মৃত্যুর পরও বহু দিবস খুব স্বচ্ছন্দভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ৺মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্র দেখিতে খুব সুশ্রী ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান্ বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইন্দ্রবংশীয় ৺বিষ্ণুচন্দ্র ইন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনিও অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল ইন্দ্র কয়েক বৎসর শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর পদে নিযুক্ত আছেন। পাঁচুগোপাল বাবুর অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অধুনা সুতরাগড়ের ঋদ্ধিমন্ত মোদকগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনিই সুতরাগড়ের সাধারণ বালিকা-বিদ্যালয়ের * প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। পাঁচুগোপাল বাবু প্রতি বৎসর সমারোহে দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন।

---

* এই বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় মহাশয়ের নাম এই পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। শশীবাবুর সম্বন্ধে আর একটী কথা স্মরণযোগ্য। ইনি নবদ্বীপাধিপতির নিযুক্ত সুতরাগড়ের রাজস্ব আদায়ের ভার-প্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীরূপে কিছু দিবস কার্য্য করিয়াছিলেন। কার্য্যকালে ইঁহার যোগ্যতা ও দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

'ইন্দ্র'বংশীয় ৺বক্রেশ্বর ইন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ইন্দ্র বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে জজ আদালতে ওকালতী করিতেছেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

'ইন্দ্র'বংশীয় বিভিন্ন শাখার শ্রীযুক্ত বক্রেশ্বর ইন্দ্রের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকান্ত ইন্দ্র বিগত বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কৃষ্ণবাবু যেরূপ শান্ত, সুশীল ও ধর্ম্মভীরু তাহাতে মোদকজাতির তাঁহার নিকট অনেক আশা আছে। ভগবান্ তাঁহাকে সুপণ্ডিত, কীর্ত্তিমান্ ও দীর্ঘজীবী করুন। বক্রেশ্বর ইন্দ্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান যামিনীকান্ত ইন্দ্র ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এই 'ইন্দ্র'বংশীয় ৺মহেশচন্দ্র ইন্দ্র 'কোম্পানী' নামে পরিচিত ছিলেন। এই 'কোম্পানী' নামের কোন বিশেষ হেতু পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোন পরিহাসপটু ব্যক্তি এই নামকরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাই চলিয়া আসিতেছে। এই মহেশচন্দ্র ইন্দ্র পূর্ব্বকথিত ৺অক্রূরচন্দ্র প্রামাণিকের দৌহিত্র।

'নাগ'বংশীয় ৺উমাচরণ নাগ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারা গঙ্গার অপর পারস্থিত গুপ্তিপাড়া বা সাতগেছিয়া হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরিবার পূর্ব্বে খুব সম্পন্ন ছিল। সুতরাগড়ের নাগবংশীয় অনেকে বেশ ধনশালী ছিলেন। এই পরিবারেব মধ্যে ৺গরীবদাস নাগ, ৺চৈতন্যচরণ নাগ ও ৺রাজকৃষ্ণ নাগ মহাশয়গণের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ৺উমাচরণ নাগ নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর তিনি দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

'নাগ'বংশীয় ৺রমানাথ নাগের পুত্র ৺কুঞ্জবিহারী নাগ "হরিপুর মডেল স্কুল" হইতে ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া চারি বৎসর শান্তিপুর নিউ স্কুলে ইংরেজি পড়িয়াছিলেন। দুঃসহ মনোবেদনায় ইংরেজি ১৮৮৩ সালে ইনি আত্মহত্যা করেন। ইহার সহোদর ৺রাসবিহারী নাগ

ইংরেজি ১৮৮৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় ইনি যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

'নাগ'বংশীয় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নাগ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সত্যময় নাগ এই বৎসর ম্যাট্রিকিউলিসন্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'রক্ষিত' বংশীয় মোদকগণের মধ্যে ৺নিধিরাম রক্ষিত মহাশয় বহু দিবস 'দোবরা' চিনি প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে এই কারবারে লাভ ছিল। বিদেশীয় চিনির আমদানী হওয়ায় 'দোবরা' চিনির আদর কমিয়া যায়। অধুনা সুতরাগড়ে দোবরা চিনি আদৌ প্রস্তুত হয় না। সুতরাগড়ে যে চিনি প্রস্তুত হয় তাহাকে সাধারণতঃ 'দলুয়া' বা 'র-সুগার' বলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সুতরাগড়ে 'লাহা' উপাধিধারী কোন মোদক বাস করিতেন না। অধুনা শ্রীহাজারিলাল লাহা নামে একব্যক্তি দোলতগঞ্জ হইতে উঠিয়া আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন।

শান্তিপুর-সুতরাগড়ের মোদক 'দাস'দিগের বংশ-তালিকা।*

আদি-নিবাস বর্দ্ধমান জেলার 'বাকতা' গ্রাম।

- গণেশচন্দ্র দাস (মৌদ্গল্য গোত্র)
  - চৈতন্যচরণ দাস
    - সাতকড়ি দাস
      - রামনারায়ণ দাস
        - অজ্ঞাত
          - অজ্ঞাত
            - অজ্ঞাত
              - ব্রজকিশোর
                - দ্বারিকচন্দ্র
                  - কার্ত্তিক
                  - সনাতন
        - শ্রীরাম
          - সুবল
            - লোচন
              - অদ্বৈত
                - রাধামোহন
                  - উমেশচন্দ্র
                    - যোগীন্দ্র
        - রামরাম (পত্নী সনাতনী)
          - গোরাচাঁদ (পত্নী জয়মণি)
            - রামহরি (পত্নী সাধুমণি)
              - মথুরামোহন (পত্নী মতিদাসী)
                - বিষ্ণুচন্দ্র
                  - বরদাপ্রসাদ
                - বিশ্বেশ্বর (নিঃসন্তান)
                - শশিভূষণ
                  - অন্নদাপ্রসাদ
                - আশুতোষ
                  - কন্যা কল্যাণেশ্বরী
        - রামকি[illegible]র
          - গোকুলচন্দ্র
            - চন্দ্রকান্ত
              - ঈশ্বর
                - লালবিহারী
                  - মন্মথ
            - [illegible]লিদাস
              - [illegible]গবান
                - বিশ্বনাথ
                  - সনাতন
                  - রজনীকান্ত
                    - গোষ্ঠবিহারী
                - পীতাম্বর
                  - হরিদাস
                - রাম[illegible]
                - মাধবচন্দ্র
                  - বিপিন
                    - নিকুঞ্জ
                      - [illegible]মোচরণ
                        - মোহিনীমোহন
                        - র[illegible]মোহন
                        - নলিনীমোহন
                      - কার্ত্তিকচন্দ্র
                        - কিশোরীমোহন
                        - প্যারীমোহন
                - গোপাল
                - মতিলাল
                  - সতীশচন্দ্র
                  - ক্ষিতীশচন্দ্র
                    - কন্যা উষাঙ্গিনী দাসী
          - তুলসীরাম
            - কানাই
              - রামমোহন
                - দ্বারিকচন্দ্র
                  - মহেন্দ্র
      - শিবরাম দাস
        - অজ্ঞাত
          - কৃপারাম
            - গৌরহরি
              - পরাণচন্দ্র
                - রামরূপ
                  - জ্যোতিশ্চন্দ্র
                    - সাগর
                - রামকৃষ্ণ
                  - অবিনাশ
              - দুর্লভচন্দ্র (পত্নী বিশ্বেশ্বরী)
                - মাণিকচন্দ্র (পত্নী কেদারেশ্বরী)
                  - কার্ত্তিকচন্দ্র
                    - হরকালী
                    - সাধু সিদ্ধেশ্বর
              - রামধন
                - কুঞ্জবিহারী
                  - রাধাবল্লভ
                    - ননীগোপাল
            - বাঞ্ছারাম
              - মহাদেব
        - নন্দরাম
          - রামনাথ
            - রামচরণ
              - মাধবচন্দ্র
                - রাজকৃষ্ণ
                  - আশুতোষ
                    - ধরণীকান্ত
                - ঘনশ্যাম

'দাস' বংশের স্বতন্ত্র শাখা।

(আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গা)

- রামলোচন দাস
  - নিত্যানন্দ দাস
    - গঙ্গাগোবিন্দ দাস
      - যদুনাথ দাস
        - যুগলকিশোর
        - কৃষ্ণকিশোর

* শান্তিপুর-সুতরাগড়ের মোদক [illegible] অন্যান্য উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বংশ-তালিকা বর্ত্তমান সংস্করণে দেওয়া ঘটিল না ; সে বিষয়ে সংগ্রাহকের অপরাধ মার্জ্জনীয়।

নবম অধ্যায়।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য।

অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের যে অবস্থা ছিল তাহার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বলিতে হয় যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে শিক্ষিত লোক প্রায় কেহ ছিলেন না। বিশেষতঃ মোদক জাতির সকলেই প্রায়ই অশিক্ষিত ছিলেন। অধুনা সুতরাগড়ের মোদক জাতির মধ্যে চারিজন গ্র্যাজুয়েট্, দুইজন ইণ্টারমেডিয়েট্ পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং অন্যূন পনর জন প্রবেশিকাপরীক্ষোত্তীর্ণ দৃষ্ট হন। এতদ্ভিন্ন অল্পবিস্তর ইংরেজি জানেন এবং বাঙ্গলা সুন্দর ভাবে লিখিতে পড়িতে পারেন মোদক জাতির মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা বহুল। পূর্ব্বে গ্রামের কোন ব্যক্তিকে 'কে তুমি?' জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই সে উত্তর করিত—'আমি' অথবা 'মুই ত?' অধুনা ঐরূপ প্রশ্নের উত্তর দেয়—'অমুক দাস' বা 'অমুক ইন্দ্র'। পূর্ব্বে গ্রামের লোক পুলিশের দারগা বা সামান্য কনষ্টবল্ আসিয়াছে শুনিয়া ভয় বশতঃ গৃহের বাহিরে আসিতে চাহিত না, অধুনা মোদকজাতীয় কাহাকেও কাহাকেও জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষগণের নিকট প্রকাশ্য সভাস্থলে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতে শুনা যায়। মোদকজাতীয়গণের মধ্যে

দুইটী যুবা ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে গ্রামে ক্লক্ ঘড়ি একটী কৌতূহলের সামগ্রী ছিল। এখন ক্লক্, টাইমপিস্ বা ওয়াচ্ অনেক গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে গ্রামে অল্প লোকেই কাপড়ের ছত্র ব্যবহার করিত। কাপড়ের ছাতা সে কালের লোকে বিলাসের সামগ্রী মনে করিত। আমি অনেক ভদ্রলোককেও তালপাতার ছাতা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অধুনা পঞ্চমবর্ষের শিশুও কাপড়ের ছত্র ব্যবহার করে। সে-কালে লোকে অম্লান বদনে 'বেনিয়ান' ও চুড়িদার আস্তিনের জামা ব্যবহার করিত। অধুনা ঐরূপ জামা ব্যবহার অসভ্যতার পরিচায়ক মনে করা হয়। পূর্ব্বে অনেক লোকে 'নাগড়া' জুতা পরিত। অধুনা সে প্রকার জুতা প্রায় দেখা যায় না। পূর্ব্বে বালক বালিকারা শীতকালে প্রায়শঃ রঙ্গিন দোলাই ব্যবহার করিত। অধুনা তৎ-পরিবর্ত্তে র‍্যাপারের প্রচলন হইয়াছে।

ভদ্র ঘরের মেয়েরাও তখন রৌপ্যনির্ম্মিত বাউটী, পৈঁচা, তাবিজ, প্রভৃতি গহনা ব্যবহার করিতেন, অধুনা চরণের অলঙ্কার ব্যতীত প্রায় সকল গহনাই স্বর্ণে নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্বে বিবাহসময়ে বংশ ও বস্ত্রনির্ম্মিত 'পাল্কী' নামক এক প্রকার যান দেখিতে পাওয়া যাইত। অধুনা পাল্কী বলিতে কাষ্ঠনির্ম্মিত যানবিশেষ বুঝায়। পূর্ব্বে বালিকা বা বৃদ্ধাদিগের জন্য "ডুলি"র ব্যবহার যথেষ্ঠ ছিল। অধুনা 'ডুলি' আর বড় একটা দেখা যায় না।

আহারাদির সম্বন্ধেও লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সমারোহের দুর্গোৎসবেও লোকে তৈলপক্ক লুচি, ও কচুরী, তৈল-পক্ক পক্কান্ন এবং কিঞ্চিৎ চিনি পাইলেই যথেষ্ট মনে করিত, এখন ঘৃতপক্ক লুচির সহিত তরকারী এবং সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়াও

লোকের মন পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে পূজার 'বৈকালী' হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চারিখানির অধিক লুচি দেওয়া হইত না, অধুনা উদরপূর্ত্তি করিয়া লুচি ভোজন করিতে পাইলেও অনেকে সন্তুষ্ট নহে। সেকালে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উৎসবে চিড়াদহির 'ফলাহার' বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। অধুনা ঐ ফলাহারের প্রচলন উঠিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ কন্যার বিবাহে কন্যাকর্ত্তা যতই কেন দরিদ্র হউন না, এখন আর তিনি কাঁচা ফলাহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। অনেক স্থলে পাকস্পর্শ বা বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণেও আজকাল আত্মীয় কুটুম্বগণকে লুচিসন্দেশ ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে খাদ্যদ্রব্যাদি সকলি বড়ই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক মণ কলাই দালের মূল্য ছিল ৷৷০ বা ৷৷৷০। অধুনা তাহার মূল্য ৫৲ টাকা। মৎস্যের মূল্য ছিল মণকরা ৫৲ টাকা। অধুনা একমণ মৎস্যের মূল্য ২৫৲ টাকা। একমণ তৈলের মূল্য ছিল ৮৲ অধুনা উহার মূল্য ২২৲ টাকা। বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের গুটির দাম ছিল ৴১০ বা ৶০ আনা। অধুনা এক গুটি বা কাঁচি এক পোয়া ঘৃতের মূল্য ৷৷৵০ বা ৷৷৴ আনা। ভয়সা ঘৃতের মূল্য ছিল প্রতিমণ ২৫৲ টাকা, অধুনা তাহার মূল্য ৫০৲ বা ৬০৲ টাকা। ১ সের দুধের দাম ছিল দুই পয়সা, অধুনা উহার মূল্য ৴০ বা ৶০ আনা। একমণ তণ্ডুলের মূল্য ছিল ১৲ বা ১৷০। অধুনা একমণ তণ্ডুলের মূল্য ৫৲ বা ৬৲। সেকালে লোকে এক পয়সার বেগুণ খরিদ করিয়া একা লইয়া আসিতে পারিত না। অধুনা খুব আমদানির সময়েও এক পয়সায় ২।৩টীর অধিক বেগুণ পাওয়া যায় না।

অধিক কথা কি বাঙ্গালীর একটী অতি সাধারণ দ্রব্য কলা এত দুষ্প্রাপ্য বা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে দরিদ্র লোকদের পক্ষে ষষ্ঠী বা লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতি নৈমিত্তিক ক্রিয়াসকল যথারীতি সম্পন্ন করা কঠিন হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় সভ্যতার বৃদ্ধি সহিত লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে সকলেই দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। সকলেরই বেশ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ ছিল। প্রতিবেশীদিগের প্রতি সকলেরই আন্তরিক ভালবাসা ছিল। গ্রাম-সম্বন্ধ মাত্র ধরিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি সকল জাতীয় লোকেই পরস্পরকে 'দাদা', 'খুড়া' প্রভৃতি মিষ্ট সম্ভাষণে অভিহিত করিত। প্রতিবেশীদিগের বিপদে আপদে সকলেই বুক দিয়া সাহায্য করিত। অভাব হইলে প্রতিবেশীরা পরস্পরের নিকট ঋণ করিত, তাহার কাগজপত্র কিছুই থাকিত না। রাজদ্বারে অভিযোগ প্রায় ছিল না। চড়কপূজা, বারোয়ারী পূজা, প্রভৃতি উৎসবে অপর সাধারণ সকলেই প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতেন।* অধুনা অনেকে ১০০৲ বা ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়াও স্বচ্ছন্দভাবে পরিবার চালাইতে পারেন না। এখন অনেককেই পেটে না খাইয়া বাহিরে লম্বা কোঁচার পত্তন দেখাইতে হয়। প্রতিবেশীর প্রতি আর বড় কাহারও সহানুভূতি দেখা যায় না। অপরকে বিশ্বাস করা দূরের কথা, অর্থাদি লইয়া আপন সহোদরকেও এখন কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবে এখন সেরূপ প্রাণ-খোলা আনন্দ দেখা যায় না। ফলকথা আমরা বাহিরের সভ্য হইতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত সুখ ও শান্তি হইতে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছি।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীনেরা প্রায় সকলেই সরলপ্রকৃতি ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। অধুনা অনেকের নিকট ধর্ম্মাচরণ

---

* পূর্ব্বে গুপ্তিপাড়ায় চড়কপূজা ও ৺জগদ্ধাত্রীপূজার বড়ই ধূম ছিল। অদ্যাপি গুপ্তিপাড়ায় অনেকগুলি বারোয়ারী জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়া থাকে—গুপ্তিপাড়ার পশ্চিমস্থ ব্রহ্মশাসননিবাসী সাধক ৺চন্দ্রচূড় তর্কপঞ্চাননমহাশয় বঙ্গদেশে ৺জগদ্ধাত্রীপূজা প্রবর্ত্তন করেন।

একটা উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা লোকের চরিত্রের এখন প্রধান লক্ষণ হইয়াছে বলিলেও হয়। পুরুষদিগের দোষ অন্তঃপুরচারিণীদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে। দেবসেবা, গুরুজনের সেবা, অতিথিসৎকার, স্বহস্তেরন্ধন প্রভৃতি ব্যাপারে নব্যাদিগের আর আদৌ অনুরাগ দেখা যায় না। পঞ্চপাণ্ডবের ভার্য্যা দ্রৌপদীও স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, কিন্তু অধুনা অবস্থার একটু স্বাচ্ছল্য হইলেই লোকে সর্ব্বাগ্রে পাচক-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া থাকে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয় ভবিষ্যতে লোকের সুখের ও শান্তির আশা বড় কম। মানুষ যতকাল কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত থাকিবে ততকাল তাহার কিছুতেই শান্তি নাই। আমরা গোপনে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া মুখে বৈরাগ্য বা পাণ্ডিত্যের ভাণ করিতে পারি। কিন্তু এরূপ আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রাণে কখনই শান্তি আসিবে না। শান্তিপিপাসু প্রত্যেক ব্যক্তিকেই খলতা, কপটতা, বিলাসিতা ও বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া সরল, সাধুহৃদয়, বিবেকী ও দীনাত্মা হইতে হইবে। প্রাচীনদিগের সারল্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার তুলনায় আজকালকার ইংরেজিশিক্ষিত বিলাসী ও কপটাচারী বাবুদিগের বিদ্যার কোন মূল্যই নাই। আত্মার কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিদ্যা ও অবিদ্যার পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন কামিনী-কাঞ্চনের দাস হইতে পারেন না।

দশম অধ্যায়।

সঙ্কলয়িতার শেষ নিবেদন।

মচ্চিতা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীযুক্ত কাৰ্ত্তিকচন্দ্র দাস মহাশয়কে অবলম্বন করিয়া আমি জন্মভূমি সুতরাগড় এবং স্বজাতি মোদকগণের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলাম। মোদকগণের বংশপরিচয় স্থলে আমি অজ্ঞতা বা ভ্রম বশতঃ কত উল্লেখযোগ্য মহাত্মার নাম আদৌ করি নাই। কত মহাত্মার গুণাবলী ঠিক না বুঝিতে পারিয়া—আমি অন্ধভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছি। নিঃস্ব ও অপ্রসিদ্ধ মোদকগণের মধ্যে কত কত সাধুপ্রকৃতি মহাত্মা ছিলেন বা আছেন। আলস্য ও অনবধানতা বশতঃ আমি তাঁহাদের নাম ও গুণাবলী লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি নাই। এজন্য আমি স্বজাতীয়গণের নিকট সবিশেষ অপরাধী। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি,—তাঁহারা সদাশয়তাপূর্ব্বক নিজগুণে এ দীনকে ক্ষমা করুন। আর একটী কথা। মোদকগণ সাধারণতঃ সকলেই বৈষ্ণব। আমি বাল্যকালে অনেককেই ভক্তিভরে নামজপ করিতে দেখিতাম। অধুনা নামজপের পদ্ধতি আর বড়-একটা দেখিতে পাই না। যুবাদিগের কথা দূরে থাকুক, প্রবীণ ও বৃদ্ধেরাও এখন অনেক সময়ে বৃথালাপে ও বৃথাকার্য্যে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ভগবন্নামে নিষ্ঠার অভাব বড়ই শোচনীয় ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শুনা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়ভক্ত সনাতনকে এক সময়ে কহিয়াছিলেন—

"নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বই ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥"

অতএব, ভাই সকল! অসার জল্পনা কল্পনা পরিত্যাগ করতঃ অবকাশকালে ভগবন্নামানুকীর্ত্তন করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করিতে মনোযোগী হউন। যিনি উচ্চকীর্ত্তন না করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে নাম-জপই প্রশস্ত। দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে আপন আপন ইষ্টমন্ত্রই জপের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু উচ্চ সংকীর্ত্তনের জন্য কলির সেই তারকব্রহ্ম নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

আমার কথা শেষ হইয়াছে। এদিকে পঞ্চাশৎ বর্ষও অতিক্রম করিয়াছি। শাস্ত্র বলেন "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ।" অতএব বনে না যাইলেও এখন আমার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট বিদায় লইবার সময়। তাই বয়োবৃদ্ধগণের পদধূলি ও শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, সমবয়স্কগণকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া এবং ভগবৎ সমীপে কনিষ্ঠগণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিয়া ধীরে ধীরে অবসৃত হইতেছি। আমি দরিদ্র। বিদায়কালে স্নেহভাজন আত্মীয়গণকে কিছু দান করিবার সম্পত্তি আমার নাই। কিন্তু স্নেহোপহারস্বরূপ ভগবন্নামানুবিদ্ধ একগাছি সঙ্গীতহার তাঁহাদের করে সমর্পণ করিতেছি। এই সঙ্গীত-হারের প্রকৃতপক্ষে কিছুই মূল্য নাই। কিন্তু বিভুনাম সংস্পর্শ হেতু ইহা অশ্রদ্ধেয় বা অব্যবহার্য্য নহে। এ দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর স্নেহোপহার তাঁহারা এক একবার কণ্ঠে ধারণ করিলেই আমি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

মহতা পুণ্যপণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্তয়া।
পারং দুঃখদধে র্গন্তং ত্বর যাব ন্ন ভিদ্যতে॥ শান্তিশতকং।

সঙ্গীতহার।

রাগিণী—গৌরী।

শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বল, বল রে হৃদয়।
জয় জয় আনন্দময়ী জয় জয় তারার জয়॥
বল কালী, বল শ্যামা, বল তারা, বল উমা
বল দুর্গা দুর্গা মা, দূর হবে ভবভয়॥
শয়নে স্বপনে বল, শ্রীদুর্গা কেবল সম্বল
গেল গেল গেল গেল, গেল রে সময়॥

ঝিঁঝিঁট।

জয় জয় জয় কালী শ্যামাসুন্দরী
তারাসুন্দরী—শিবসুন্দরী।
ভবানী ভবরাণী মা নিত্যানন্দকরী॥
ত্রিভুবন মোহিনী, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী
নিখিল ভয়হারিণী, ত্রিতাপক্ষয়করী॥
নিরাকারা নিরুপমা, সাকারা সর্ব্বপ্রতিমা
যোগিজন-প্রিয়তমা, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী॥
লীলাময়ী, জগদ্ধাত্রী, বিশ্বমাতা, বিশ্বকর্ত্রী
শুদ্ধ প্রেমভক্তিদাত্রী, বিমলা বিশ্বেশ্বরী॥

ভৈরবী।

গোপাল গোবিন্দ হরি আনন্দে বল বদন।
কালী তারা শ্রীদুর্গা নাম জপরে মন অনুক্ষণ॥
বল গণপতি সরস্বতী, ভাস্কর ভাগীরথী।
জয় জয় পশুপতি সর্ব্বদুর্গতিহরণ॥
বল লক্ষ্মী নারায়ণ, বল কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
বল জয় মধুসূদন, ঘন ঘন নিশিদিন॥
জয় জয় সীতারাম, শিবদুর্গা রাধাশ্যাম।
বল জয় ব্রহ্মনাম, অবিরাম দিয়ে মন॥

পরজ বাহার।

হরি আর কেন মায়ায় ঘুরাও।
কাতর জনেরে বল আর কেন কাঁদাও॥
আনিয়ে হে লীলাছলে এ ধরাতলে।
সুখসেব্য কত ভোগ্য দিয়ে ভুলালে,
মায়ায় ফেলে আমায় মজালে—
বিষয়েতে সুখ যত, বুঝালে হে বিধিমত
এখন হয়ে সদয়, হে দয়াময়, শ্রীপদে স্থান দাও॥
তোমা লাগি অনুরাগী কর এ দীনেরে।
সদা সঙ্গে প্রেমরঙ্গে মাতায়ে রাখ মোরে,
(তোমার) এ জীবন লও তোমা তরে—
করিয়ে প্রেমবিহ্বল, সদা বলাও হরিবোল
প্রেমসুধা দিয়ে নাথ দাসেরে বাঁচাও॥

ভৈরবী।

হরিনামে হরিপ্রেমে যাও রে মাতি।
জয় হরি দয়াময় গাও দিবারাতি॥
হরি হরি হরি বল, মন প্রাণ হবে শীতল।
শ্রীহরি চির সম্বল, সঙ্গের সাথী॥
যাবৎ রহে জীবন, গাও হরির গুণগান।
বিনা সে অভয়চরণ, নাহিক গতি॥
কি লাগিয়ে কোন আশে, আছ বদ্ধ মায়াপাশে
ভুলনা ভাই হৃদয়েশে ধর মিনতি॥

ঝিঁঝিট।

জয় জয় নারায়ণ, জয় মধুসূদন
জয় শ্রীহরি, গোপাল, কৃষ্ণ, জয় ভবতারণ॥
জয় জয় হৃষীকেশ, প্রাণবন্ধু প্রাণেশ।
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ, বিশ্বজনশরণ॥
জয় বিভু অন্তর্য্যামী, জয় হরি হৃদয়স্বামী,
জয় বিষ্ণু সর্ব্বগামী, প্রেমিকের প্রাণধন॥
জয় কৃষ্ণদয়াময়, পতিতের আশ্রয়
লীলাপ্রিয়, লীলাময়, গোবিন্দ, গোপীজীবন॥

ঝিঁঝিট।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, বল ভাই বন্ধুগণ।
ঐ ভুবনমঙ্গলনাম শ্রবণে জুড়াই প্রাণ॥
কৃষ্ণনাম ভালবাসি, মনে তাই অভিলাষি
শুনি নাম দিবানিশি, প্রেমেতে হয়ে মগন॥
সদা সাধ হয় মনে, বসি প্রিয় জনসনে
প্রাণনাথের গুণগানে সফল করি জীবন॥
আমার মরণ কালে, তোমরা বন্ধু সকলে।
দিও নাম কর্ণমূলে, ভুলনা এই নিবেদন॥

সুধী ও শান্তিপিপাসু পাঠকগণের অতৃপ্তিকর হইবে না এই বিশ্বাসে পরে আরও কতকগুলি ভজন বা সাধকসঙ্গীত সংযোজিত হইল।

মনোশিক্ষা ও প্রার্থনা-মালা।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

১

রাম রাম বল ওরে বল পাপ মন।
কি লাগিয়া এলে ভবে কর রে স্মরণ॥
দেখিতে দেখিতে তব দিন চলি যায়।
প্রাণভরি বল রাম শেষের সহায়॥
কি পাইয়া আছ ভুলে রামের চরণ।
চাহিয়া দেখ রে মন শিয়রে শমন॥
বিফলে বহিছে কাল রিপুর সেবায়।
থাকিতে সময় এবে ধর রাম পায়॥
অশেষ পাতক তুমি করেছ জীবনে।
কাঁদিয়া শরণ লও রামের চরণে॥
পাপেতে হলে প্রবীণ নাহি ভক্তিলেশ।
রাম বিনা কে ঘুচাবে তব ভব-ক্লেশ॥
বিষয় বিষম মায়া বুঝেও বোঝ না।
দয়াল রামের গুণ জেনেও জান না॥
কি ধন পাইয়ে তুমি ভুলিলে শ্রীরাম।
শেষের সম্বল নাই বিনা রাম নাম॥

রাম নামে হরে পাপ ঘুচে কুবাসনা।
রাম নামে চিত্ত শুদ্ধ পবিত্র রসনা॥
রাম নামে হরে শোক নাশে ভবক্ষুধা।
রাম নামে হরে ভয় প্রাণে ঢালে সুধা।
এমন রামের গুণ ভুলনা রে মন।
অভয় চরণ দুটী কর রে স্মরণ॥
বড় অপরাধী তুমি আছ রামপদে।
এখনি শরণ লও তরিবে বিপদে॥
কর্ণভরি শুন নাম মুখে বল ' রাম '।
নেত্রে চাহি দেখ রাম রূপ অভিরাম॥
কি সুন্দর রাম রূপ ভুবনমোহন।
জগৎ ভরিয়া রূপ কর দরশন॥
হেরিতে হেরিতে রূপ আয়ু কর শেষ।
দমে দমে জপ ' রাম ' কহিনু বিশেষ॥

২

কাহারে কহিব আমি পরাণের ব্যাথা।
দয়াল ঠাকুর মোর শুন দুঃখ কথা॥
অমৃত নামেতে তব না হইল রতি।
বিষয় গরল পানে সতত কুমতি॥
পশু পক্ষী আদি যোনি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
পেয়েছি মানব তনু ভজন লাগিয়া॥
ভোজনের লাগি প্রভু ভুলিনু ভজন।
হারানু ধনের লোভে দুর্ল্লভ চরণ॥

'রাম' 'রাম' 'রাম' 'রাম' না জপিনু মুখে।
অকথা কুকথা কয়ে থাকি মনোসুখে॥
বৃথাবাক্যে বৃথা কার্য্যে কাটানু জীবন।
আয়ু যে ফুরায়ে যায় কি করি এখন॥
বড়ই অধম মুঞি বড় দুরাচার।
রাম হে করুণাসিন্ধু কর মোরে পার॥
ভবধামে এ অধমে রাখিবে যদ্দিন
দয়া করে শ্রীচরণে করহে অধীন॥
রাঙ্গাপায় রাখ বেঁধে দিও নাক ছাড়ি।
কাতরে শ্রীহরি মুঞি এই ভিক্ষা করি॥
এই কৃপা কর মোরে ওহে দীননাথ।
সতত রহিতে যেন পারি তব সাথ॥
দিবস রজনী যেন স্মরি তোমাধন।
সুধাসম রামনামে মজে যেন মন॥
উঠিতে বসিতে যেন গাহি 'রাম' 'রাম'।
শয়নে স্বপনে জপি ও মধুর নাম॥
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন রাম নাম স্মরি।
রাম-কার্য্য বলি যেন সর্ব্বকার্য্য করি॥
জগতে যতেক কিছু সবই রামময়।
জয় জয় জয় রাম, শ্রীরামেরি জয়॥

৩

ভজ মন রামরূপ ব্রহ্ম নারায়ণ
হেলায় না হারাইও পরমরতন॥

এমন দয়াল প্রভু নাহি দেখি আর।
'রাম' 'রাম' বলি ডাক পাইবে নিস্তার॥
কর্ণেতে পশিলে নাম যাবে সব দুঃখ।
শীতল হইবে প্রাণ পাবে মহাসুখ॥
পরম দয়াল রাম পতিতের বন্ধু।
অনাথের নাথ রাম করুণার সিন্ধু॥
সকল ছাড়িয়া মন রাম কর সার।
শ্রীরাম-চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
শীতল চরণদুটী করিলে আশ্রয়।
দূর হবে পাপ তাপ ঘুচে যাবে ভয়॥
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে কর রাম ধ্যান।
শয়নে স্বপনে মুখে বল রাম নাম॥
জন্মাবধি যতপাপ করিয়াছ তুমি।
সন্ত হরিবেন সেই হরি অন্তর্যামী॥
রামনামে গেল ত'রে দস্যু রত্নাকর।
বাল্মীকি বলিয়া খ্যাত হলো চরাচর॥
রচিল অপূর্ব্বকথা নামে 'রামায়ণ।'
সে পুণ্য-কাহিনী শুনি ধন্য ত্রিভুবন॥
পাষাণী হলো মানবী রামপদ গুণে।
কাষ্ঠতরি হলো সোণা রেণুরস্পর্শনে॥
কোটী কোটী মহাপাপী জপি রাম নাম।
অনায়াসে ভবকূপে পেলে পরিত্রাণ॥
মহাভক্ত হনুমান রামে সঁপি প্রাণ।
অমর হইয়া এবে ভ্রমে সর্ব্বস্থান॥

অদ্যাপি যথায় যবে রাম নাম হয়।
বীরভক্ত থাকি গুপ্ত শ্রবণ করয় ॥
স্মরিয়া হনুর রীতি বল 'রাম' 'রাম'।
সুধামাখা নাম জপি' যাও প্রেমধাম ॥

৫

আশীর্ব্বাদ মাগি মুঞি দয়া কর রাম।
মো অধমে দয়াময় হও না ক বাম ॥
অধম-তারণ তুমি ভকত-জীবন।
কাঙ্গাল-শরণ হরি পতিত-পাবন ॥
দরিদ্রের সখা তুমি তার যদি তরি।
তোমা বিনা এ পাপীরে কে তরাবে হরি ॥
এ ঘোর সংসারে হেরি সকলি অসার।
রাম হে তোমারি পদ একমাত্র সার ॥
দয়াময় পদযুগ শিরে দাও তুলি।
জন্মে জন্মে ও চরণ যেন নাহি ভুলি ॥
দাস বলি এ অধমে কর হে স্বীকার।
তবে ত মানিব ধন্য জনম আমার ॥
ভুলায়ে রেখেছ নাথ দিয়া মিছা মায়া।
তোমারে ধরিতে যাই না পাই খুঁজিয়া ॥
চতুরের শিরোমণি ওহে গুণধাম।
দয়া করি দাও ধরা নবঘন শ্যাম ॥
চাতুরী ক'র না নাথ অধীনের সনে।
তব কৃপা বিনা কিসে পাব তোমা ধনে ॥

বড়ই কাতর প্রাণ তোমায় লভিতে।
দরশন আশে মুঞি চাহি চারি ভিতে॥
দয়াকরি দাও দেখা ওহে প্রাণনাথ।
আজ্ঞা কর থাকি মুঞি সদা সাথ সাথ॥
হেরিয়া তোমার রূপ জুড়াই জীবন।
যে লাগিয়া আসা ভবে এ ভব-বন্ধন॥
মায়ারজ্জু কর নাথ কর হে ছেদন।
প্রেমানন্দে জপি রাম কৃষ্ণ নারায়ণ॥

—— —

৫

কি আর জানাব রাম তুমি মোর প্রাণ।
হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি সাধনার ধন॥
তুমি বেদ তুমি বিধি তুমি তন্ত্র মন্ত্র।
তুমি মহাযন্ত্রী আর মুঞি তব যন্ত্র॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু অর্ক গণপতি।
সাবিত্রী গায়ত্রী তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী তারা।
তুমি শিব তুমি দুর্গা ভব-দুঃখহরা॥
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম নৃসিংহ বামন।
সর্ব্ব অবতার তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥
গৌরাঙ্গ-সুন্দর তুমি, তুমি নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র আর যত ভক্তবৃন্দ॥
সকলি তুমি হে রাম তোমারি ত সব।
নয়নে যা কিছু হেরি তোমারি বৈভব॥

রামরূপে রামনামে পূর্ণ বিশ্বধাম।
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিছে ধ্বনি 'রাম' 'রাম' 'রাম'॥
সনক সনন্দ সদা জপে রাম নাম।
বীণাযন্ত্রে দেবঋষি গান 'রাম' 'রাম'॥
ধ্রুব প্রহ্লাদাদি যত মহাভক্তগণ।
দিবানিশি রাম প্রেমে আছেন মগন॥
মহেশের পঞ্চমুখে সদা 'রাম' 'রাম'।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখে গান রাম নাম॥
ভুবন ভরিয়া সবে রাম গুণ গায়।
গাহিতে শ্রীরাম নাম তাই প্রাণ চায়॥
রাম হে শিখাও মোরে গাহি 'রাম' 'রাম'।
অবিরাম জপি 'রাম' যাই রাম-ধাম॥

৬

গণেশ গোবিন্দ জপ ঈশান ঈশানী।
শ্রীহরি শ্রীহরি জপ জপ রাধারাণী॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ নাম কর মন সার।
শ্রীরাধা শ্রীরাধা জপি হও ভব পার॥
গোবিন্দ-চরণ দুটী ভাব দিবানিশি।
শ্রীপদে আছেন মজে যত যোগীঋষি॥
জগতের সারধন শ্রীরাধারমণ।
ভুবন-পাবন হরি ভকত-জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলিতে মন হওনা অলস।
অক্ষরে অক্ষরে নামে ঝরে সুধারস॥

কত মধু কত সুধা 'শ্রীকৃষ্ণ' নামেতে।
কেমনে বুঝিবে মন সেনামে না মেতে॥
নামরসে যে মেতেছে সেই গেছে ত'রে।
নিষ্ঠা করি বল মন 'হরে কৃষ্ণ হরে'॥
কিসের ভাবনা তুমি ভাব ওরে মন।
গোবিন্দ সখার গুণ গাও অনুক্ষণ॥
কে তোমায় আনি দেয় ক্ষুধাকালে অন্ন।
কে যোগায় পিপাসায় জল সখা ভিন্ন॥
অন্নবস্ত্র আদি সব সখার কৃপায়।
গোবিন্দ করিলে দয়া কিবা নাহি হয়॥
গোবিন্দ করেন রক্ষা ডাকিলে কাতরে।
গোবিন্দ ইচ্ছায় জীব জীয়ে আর মরে॥
কাষ্ঠ-পুত্তলিকা তুমি কোন্ শক্তি ধর।
গোবিন্দ চালান বলি তাই চল ফের॥
বলবুদ্ধি যত কিছু শ্রীগোবিন্দ-পদ।
গোবিন্দের খেলা সব সম্পদ বিপদ॥
এ ভবসাগরে মন আছে বহু ভয়।
গোবিন্দে সঁপিলে প্রাণ সব দূর হয়॥
চিরবাস তরে নহে এ ভবভবন।
অবশ্য ত্যজিতে হবে যত প্রিয়জন॥
জীবন অনিত্য জানি স্মর নিত্যধনে।
দিবানিশি শ্রীগোবিন্দ জপ রে বদনে॥
ভাই বল বন্ধু বল আর পরিজন।
অন্তিম কালেতে মন কে তব আপন॥

শেষের দিনেতে জেন গোবিন্দ সহায়।
উপায় কেবল মন সেই রাঙা পায় ॥
গোপাল গোবিন্দ বল আয়ু হয় ক্ষয়।
গোবিন্দ বলিতে আর পাবে না সময় ॥
এখনি বল রে মন শ্রীগোবিন্দ হরি।
গোবিন্দ করিলে কৃপা যাবে ভবে তরি ॥
কত কত মহাজন এভব সাগরে।
গোবিন্দ শরণ লয়ে হেসে গেল ত'রে ॥
তাই বলি ওরে মন জপ শ্রীগোবিন্দ।
প্রাণ মাঝে পূজ সদা সেই পদদ্বন্দ্ব ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ছাড় যত মায়া।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ভুল ভবছায়া ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ জপ উঠিতে বসিতে।
গোবিন্দ গোবিন্দ জপ খাইতে শুইতে ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি ছেড় এই প্রাণ।
গোবিন্দ করিবে দয়া পাবে পরিত্রাণ ॥

৭

জয় রাম জয় শ্যাম জয় নারায়ণ।
জয় কৃষ্ণ জয় হরি জয় জনার্দ্দন ॥
জয় দুর্গা জয় শিব জয় সীতারাম।
জয় লক্ষ্মী সরস্বতী জয় রাধাশ্যাম ॥
জয় কালী জয় তারা জয় মা ভবানী।
দিনেশ গণেশ জয় জয় শূলপাণি ॥

জয় গয়া জয় গঙ্গা কাশী বৃন্দাবন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া সাগরসঙ্গম ॥
শ্রীক্ষেত্র শ্রীকুরুক্ষেত্র সেতু রামেশ্বর।
কৈলাস কেদার কাঞ্চী তারক ঈশ্বর ॥
চন্দ্রনাথ বৈদ্যনাথ একাম্রকানন।
প্রয়াগ প্রভাস তীর্থ বদরিকাশ্রম ॥
অবন্তী দ্বারকাপুরী শ্রীনৈমিষারণ্য।
জ্বালামুখী কামাখ্যাদি শ্রীতীর্থ অগণ্য ॥
নানা নামে নানা স্থানে শ্রীমধুসূদন।
গৃহে বসি ভোলা মন কররে স্মরণ ॥
অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম নাম সার।
জানিয়া অবোধ মন জপ বার বার ॥
জপ গঙ্গা জপ ব্রহ্ম জপ নারায়ণ।
জপ দুর্গা জপ শিব জানকী জীবন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জপ, জপ নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জপ, জপ শ্রীগোবিন্দ ॥
জপ "রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥"
রামকৃষ্ণ পাদপদ্ম স্মর ওরে মন।
বিজয়কৃষ্ণেরে স্মর সিদ্ধির কারণ ॥
গুরুকৃপা বিনা মন নাহি গতি আর।
শ্রীগুরুচরণ মন কর সদা সার ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু বন্ধুবর ॥

গুরু বেদ গুরু বিধি গুরু সর্ব্বসার।
শ্রীগুরু-ভজন বিনা নাহিক নিস্তার॥
গুরুধ্যান গুরুজ্ঞান গুরুমাত্র গতি।
শ্রীগুরু কৃপায় হয় বিশ্বাস ভকতি॥
গুরুকৃপা বিনা নাহি ইষ্ট দরশন।
শ্রীগুরুচরণ ভজ মজাইয়া মন॥
ভবকর্ণধার গুরু ইহ পরকাল।
শ্রীগুরু প্রসাদ বিনা সকলি বিফল॥
সাধন ভজন ভক্তি যত কিছু আর।
শ্রীগুরুচরণ জেন সর্ব্বমূলাধার॥
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে শ্রীগুরুর স্থিতি।
ভক্তিভরে গুরুপদে কর নতিস্তুতি॥
শ্রীগুরুস্মরণে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
প্রেমানন্দে বল জয় শ্রীগুরুর জয়॥

৮

ভক্তাধীন ভগবান শুনেছ রে মন।
ভক্তিমূল্যে যায় কেনা সে রাঙ্গাচরণ॥
যুগে যুগে শ্রীগোবিন্দ ভক্তে রক্ষা করে।
ভক্তেরে পালিতে হরি কত মূর্ত্তি ধরে॥
সত্যেতে হলেন হরি নৃসিংহ বামন।
ত্রেতায় হলেন রাম রাজীবলোচন॥
দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসবিহারী।
কালীয়দমনকারী গোবর্দ্ধনধারী॥

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ ভীষ্মের আরাধ্য।
ভক্তিগুণে বিদুরের হইলেন বাধ্য॥
অকিঞ্চন ভক্তে কৃষ্ণ সদা কৃপা করে।
ভক্ত পাছু পাছু কৃষ্ণ দিবানিশি ফেরে॥
স্ত্রীপুরুষ নাহি মানে ভক্তি মাত্র চায়।
মনে প্রাণে যেই ডাকে সেই কৃষ্ণে পায়॥
"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী"।
প্রাতঃস্মরণীয়া হ'লো পাইয়ে শ্রীহরি॥
তাই বলি ওরে মন ভুলনা সে ধনে।
বিকায়ে থাক রে তুমি হরির চরণে॥
কত কব প্রভু মোর প্রেমেতে পাগল।
জীবের মঙ্গল লাগি সদাই চঞ্চল॥
পাপীতাপী উদ্ধারিতে গৌররূপ ধরি।
হরিনাম বিলাইল আপনি শ্রীহরি॥
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
নাচিল সোণার গৌর কত প্রেমরঙ্গে॥
রাধাকৃষ্ণ এক অঙ্গে সাজিল সুন্দর।
বলাই হ'লো নিতাই কিবা মনোহর॥
"জয় রাধে" "জয় কৃষ্ণ" গাহি দ্বারে দ্বারে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র পাপীরে উদ্ধারে॥
"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়"।
দন্তে তৃণ ধরি জীবে শ্রীনাম বিলায়॥
অধুনাও সেই লীলা করে গৌরহরি।
যে হেরে বিশ্বাস-নেত্রে সেই যায় তরি॥

তাই বলি ওরে মন ধর রে মিনতি।
শ্রীগৌরচাঁদেরে তুমি ভজ দিবারাতি॥
সেই রাধা সেই কৃষ্ণ সেই শ্রীগোবিন্দ।
গোলোকবিহারী হ'লো নদীয়ার চন্দ॥
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদে সেই পায় রাধা।
রাধা-প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গ আছে সদা বাঁধা॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি কভু নয় ভিন্ন।
যুগে যুগে অবতরি জীবে করে ধন্য॥
দিবানিশি জপ মুখে গৌরাঙ্গ নিতাই।
জয় জয় জয় প্রভু অদ্বৈত গোসাঞি॥
নিতাই গৌরাঙ্গ পার করিবে নিশ্চয়।
প্রেমানন্দে বল জয় গৌরাঙ্গের জয়॥

৯

কোথায় হৃদয়নাথ এস কৃপা করি।
পেতেছি হৃদি-আসন ব'স আজ হরি॥
মরমের দুঃখ কিছু জানাই তোমারে।
শুনিতে হবে হে প্রভু দীনে দয়া করে॥
এ ভব-গহনে মোর কেহ নাহি সাথী।
নিশীথে নির্জ্জনে তাই দুঃখ-কথা গাঁথি॥
কারো পানে নাহি চাই বিনা তোমা ধন।
তোমার ভরসা আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥
তাই বলি ওহে নাথ কর মোরে দয়া।
নিরাশ্রয়ে কর রক্ষা দিয়া পদছায়া॥

এ জগতে নরলীলা দেখালে বিস্তর।
মানব স্বভাব ভাবি ব্যথিত অন্তর ॥
দেবলীলা এবে কিছু দেখাও শ্রীহরি।
সুরসঙ্গে প্রেমরঙ্গে তব গুণ স্মরি ॥
হেরিয়া তোমার লীলা জুড়াই পরাণ।
হরি হরি বলি নাথ গাই গুণগান ॥
জীবন পথের সাথী ছিল প্রভু যারা।
একাকী ফেলায়ে মোরে গেল চলে তারা ॥
এ হৃদয় গেছে ভেঙ্গে কাঁদিছে সদাই।
কোথা দয়াময় বলি ডাকি নাথ তাই ॥
করাল কালের ছায়া ঘিরিয়াছে মোরে।
ভয় পেয়ে তাই নাথ ডাকি হে তোমারে ॥
পৃথিবীর কোন সুখ নাহি লাগে ভাল।
আহার বিহার যেন কেবল জঞ্জাল ॥
দূর কর দীননাথ এ দুঃখ যাতনা।
তব নাম হো'ক মোর সতত সাধনা ॥
তোমার দয়াল নামে হো'ক মোর রতি।
আন কথা কহিবারে ঘুচুক শকতি।
প্রেমভরে গাহি সদা তব নামাবলী।
'শ্রীহরি' 'শ্রীহরি' বলি নাচি বাহু তুলি ॥
তব রূপ যেন হেরি অনলে অনিলে।
তব রূপ হেরি যেন ভূতলে পাতালে ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেরিয়া তোমারে।
প্রাণ খুলি নাম গান করি ভক্তিভরে ॥

শ্রীহরি অনাথবন্ধু কর হে করুণা।
সুধামাখা নামে মোর মজুক্ রসনা ॥

১০

হে প্রাণেশ পরমেশ হৃদয়ের সখা।
দয়া ক'রে প্রাণনাথ দাও মোরে দেখা ॥
এ ভব তুফানে হরি পাই বড় ভয়।
ভীত জনে কর রক্ষা ওহে দয়াময় ॥
তোমা বিনা ওহে নাথ কেহ নাহি মোর।
ভরসা তোমার পদ বিদ্যা বুদ্ধি জোর ॥
ভাবিয়া দেখিনু হরি এ তিন ভুবনে।
সার মাত্র তব নাম জীবনে মরণে ॥
পৃথিবীর বন্ধু যারা না হয় আপন।
স্বার্থসিদ্ধি হেতু মাত্র প্রণয়বন্ধন ॥
কাহারও ভরসা এবে নাহি করি হরি।
বুঝেছি সম্বল মাত্র ও চরণ তরি ॥
এ ভবের যশঃ মান সকলি অসার।
না বুঝে অসারে মুঞি করিয়াছি সার ॥
বৃথা কার্য্যে বৃথা বাক্যে হ'ল আয়ুক্ষয়।
আর ত নাহি সময় রক্ষ দয়াময় ॥
কত জ্ঞানী কত ধনী বীর মহাপ্রাণ।
এ ভবে প্রবাস-পরে করেছে প্রয়াণ ॥
নাম মাত্র কারো আছে আর সব লয়।
এ ভবের ধূলাখেলা নাট্য অভিনয় ॥

এক দল যায় চলি আর দল আসে।
মায়াবশে প্রবাসে স্ববাস বলি বাসে ॥
বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি ঋষি মুনি যত।
পুণ্যলীলা করি শেষ হয়েছেন গত ॥
মান্ধাতা মরুত্ত আদি ভূপাল প্রখ্যাত।
ভীষ্ম কর্ণ ভীমার্জ্জুন মহাবীর যত ॥
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির আদি নৃপমণি।
কালিদাস ভবভূতি কাব্যরস-খনি ॥
স্বদেশে বিদেশে কত পুরুষ পুঙ্গব।
লীলা অন্তে কালস্রোতে ভেসেছেন সব ॥
মর্ত্ত্য লোকে যতদিন আছিলেন তাঁরা।
যশঃ কীর্ত্তি গানে সদা মেতেছিল ধরা ॥
এবে তাঁহাসবে ভবে কয় জনে স্মরে।
ক্ষুদ্র নর বৃথা কার্য্যে সময় সম্বরে ॥
কীর্ত্তি জয় যশঃ মান পাইবার আশে।
অবোধের মত মুঞি ঘুরি দেশে দেশে ॥
অসার কল্পনা আর নীচ ইচ্ছা লয়ে।
দুর্লভ জনম মোর যায় যে বহিয়ে ॥
তাই বলি ওহে হরি ভুলাও না আর।
পদছায়া দিয়ে দাসে করহে নিস্তার ॥
অনেক কেঁদেছি নাথ আর ত পারি না।
শুকাল নয়ন জল না হলো চেতনা ॥
বল বুদ্ধি পরমায়ু হয়ে এলো শেষ।
দুর্দ্দিনে চরণে মতি দাও হে প্রাণেশ ॥

ভীষণ মোহ আঁধারে তুমি মাত্র জ্যোতিঃ।
পরাণ-প্রয়াণ কালে তুমি মাত্র গতি ॥
তাই নাথ ভবভয়ে ডাকি বার বার।
আর্ত্তজনে শ্রীচরণে রাখ হে এবার ॥
কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো দয়া কর হরি।
রাঙ্গাপদ হৃদে ধরি প্রাণ পরিহরি ॥

১১

মধুর শ্রীদুর্গানামে না মজিল মন।
বৃথায় করিনু মুঞি এ দেহ ধারণ ॥
'দুর্গা' 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলি তরে দেব নর।
ব্রহ্মময়ীর ঐ নাম জপেন শঙ্কর ॥
সত্য যুগে সুরথ রাজা শ্রীদুর্গা পূজিয়ে।
পাইল পরমপদ ভক্তিতে মজিয়ে ॥
ত্রেতায় শ্রীদাশরথী রাম রঘুমণি।
অকাল বোধনে মার চরণ দুখানি ॥
ভক্তিভরে করি পূজা লভিলেন বর।
দুষ্ট রাবণে বধি জিনিলেন সমর ॥
দ্বাপরে জননী দুর্গা যোগমায়া রূপে।
সাধিলেন নানা কার্য্য বধি কংস ভূপে ॥
মহারাস আদি যত কৃষ্ণলীলা সব।
মহামায়ার মায়ায় হইল সম্ভব ॥
কলিতে কমলাকান্ত শ্রীরামপ্রসাদ।
শ্রীদুর্গা পূজিয়ে পান শ্রীদুর্গা-প্রসাদ ॥

যুগে যুগে দয়াময়ী জীবে কৃপা করে।
যে ডাকে 'শ্রীদুর্গা' বলে সেই যায় তরে ॥
দুর্গার করুণা-ধারা বহে নিরন্তর।
দুর্গতিহারিণী দুর্গা কহে নারী নর ॥
দশ হস্তে দশভুজা পালেন জীবেরে।
মহামায়া করি দয়া দীনেরে উদ্ধারে ॥
তাই বলি ওরে মন জপ 'দুর্গা' নাম।
শয়নে স্বপনে দুর্গা জপ অবিরাম ॥
প্রভাতে 'শ্রীদুর্গা' বলি কর শয্যা ত্যাগ।
সারা দিন কর তুমি দুর্গানাম যাগ ॥
ভুবনমোহিনী মাকে মানসে আঁকিয়া।
শ্রীপদ-পদ্মেতে মজ জগৎ ভুলিয়া ॥
প্রাণভরি 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলি ডাক মায়।
জননী কৃপায় স্থান পাবে রাঙ্গা পায় ॥

১২

'কালী' 'কালী' 'কালী' 'কালী' বল পাপ মন।
কলিতে কালীর নাম পরম সাধন ॥
সর্ব্বশক্তিময়ী কালী সর্ব্বার্থদায়িনী।
ভবভয়হারা কালী ত্রিলোকতারিণী ॥
কালীপাদপদ্মে যার মজিয়াছে প্রাণ।
সুধামাখা কালী নাম সদা যার গান ॥
কালীমূর্ত্তি দরশনে যাহার লালসা।
কালীপদে বিনা যার নাহি কোন আশা।

যে জন কালীরে জানে পরতত্ত্ব সার।
বিশ্বপ্রসবিনী কালী সর্ব্বমূলাধার।
সেই সে কালীরভক্ত জীবন্মুক্ত যোগী।
পদরেণু পেলে তার তরে ভবরোগী॥
সব সুখ ত্যজি মন মজ কালী নামে।
শুদ্ধাভক্তি লভি ধন্য হবে পরিণামে॥
কালীরূপ ধ্যান তুমি কর দিবারাতি।
যুবতী বালিকা বৃদ্ধা কালীর মূরতি॥
সুরূপা কুরূপা কিম্বা সতী কি অসতী।
যখনি স্ত্রীমূর্ত্তি হের করহ প্রণতি॥
ভগিনী জননী জায়া আদি রূপ ধরি।
জীবসঙ্গে নানা রঙ্গে খেলেন ঈশ্বরী॥
কালী-মার লীলা তুমি হের সর্ব্বক্ষণ।
মায়ে নিরখিয়ে কর সার্থক জীবন॥
কালী বিনা ত্রিভুবনে অন্য কেবা আছে।
দুঃখ ঘোরে এ সংসারে যাবে কার কাছে॥
অবোধ বালক জীব বাঁচিবে কেমনে।
যদি কালী না করিবে কৃপা নিজগুণে॥
তাই বলি জগন্মাতঃ ক্ষম অপরাধ।
রাঙ্গাপায় দাও স্থান পূরাও মা সাধ॥

১৩

আশুতোষ ভোলানাথ মহেশ ঈশান।
ঈশ্বর শঙ্কর শিব পুরুষপ্রধান॥

আদিদেব মহাদেব করুণাসাগর।
ভক্তবৎসল হর পিতঃ বিশ্বেশ্বর॥
সদানন্দ মৃত্যুঞ্জয় মহাযোগীবর।
কাতরে ডাকি হে প্রভো কৃপানেত্রে হের॥
পরমাত্মা পরব্রহ্ম তুমি হে পরেশ।
তোমার স্মরণে নাহি থাকে দুঃখ লেশ॥
সংসার মোচন হয় শ্রীরূপ ধ্যানেতে।
তাই পিতঃ তবপদে বাসনা মজিতে॥
আনন্দঘন মূরতি যে হেরে নয়নে।
কি ভয় তাহার আর এ ভব গহনে॥
করুণাকটাক্ষে প্রভু চাহ একবার।
অধন্য জীবন ধন্য হউক আমার॥
এ ঘোর সংসারে প্রভো তুমি মাত্র গতি।
তুমিই জগদ্‌স্বামী জগতের পতি॥
মায়াতীত মায়াধীশ তুমি হে ঈশ্বর।
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার সর্ব্বমূর্ত্তি-ধর॥
এ বিশ্ব ব্যাপিয়া তুমি আছ বিশ্বনাথ।
ভক্তগণে তব ধ্যানে থাকে তব সাথ॥
"ব্যোম ব্যোম মহাদেব" এই মহাধ্বনি।
উঠিতেছে দিবানিশি পূরিয়া অবনী॥
সে ধ্বনি শ্রবণে হয় সর্ব্ব পাপক্ষয়।
মায়ামুক্ত হ'য়ে জীব লভয়ে অভয়॥
ভীতিহর মহেশ্বর বড় ভীত হ'য়ে।
সভয়ে ডাকি হে পিতঃ কাতর হৃদয়ে॥

দেখাও অভয় কর ওহে দিগম্বর।
ত্রিশূলী ত্রিশূলহস্তে দাসে রক্ষা কর ॥
জনমে জনমে আমি তব ক্রীতদাস।
ঐ চরণ ভরসা মোর ঐ পদে আশ ॥
যোগেশ যোগীন্দ্র শিব গিরিশ মহেশ।
হর হর ব্যোম ব্যোম অনাদি অশেষ ॥
কুকর্ম্মীরে কর কৃপা হে তারকনাথ।
দয়া করি এ দীনেরে রাথ সাথ সাথ ॥
কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর মহাদেব হর।
কৃপা করি নিজধামে লও হে কিঙ্কর ॥
ও রাঙ্গাচরণ আশে ধরি এই প্রাণ।
আশুতোষ ভোলানাথ কর মোরে ত্রাণ ॥

যৎ কৃতং যৎ কারষ্যামি তৎসর্ব্বং ন ময়া কৃতং।
ত্বয়া কৃতস্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন॥
প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রত্যুষন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তবপূজনং ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

WORKS BY THE SAME AUTHOR.

1. A DISCOURSE ON THE STUDY OF SANSKRIT
Price 3 Annas.

2. STRAY NOTES ON THE STUDY OF ENGLISH.
Price 3 Annas.

3. A JUNIOR ENGLISH TRANSLATION.

(Book No. 3 is written in conjunction with Babu Dwijapada Banerjee M. A. Professor, Daulatpur Hindu Academy.)

Price 10 Annas.

4. সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—মূল্য ছয় আনা।

A FEW OPINIONS OF THE PRESS AND OF COMPETENT CRITICS.

"THE STUDY OF SANSKRIT"

"In the course of his learned writing, Babu Bisweswar has shown the importance of the study of Sanskrit and its relation to the national life of the Hindus. * * * * * speaking as a Hindu the writer says :—"We must study Sanskrit, study it to keep our national Spirit alive—to hold communion with the Gods and Goddesses of our *Shastras* and, above all, to be worthy of those lofty ideals which our mighty sages have left for us." In another place he says "To be born of a Hindu and to be deprived

of the blessings derivable from the study of such a literature is to be deprived of the chief enjoyments of life." While appreciating the value of such a discourse, we do not overlook the elegant style in which it is written."

—The Bengalee, December 30th, 1909.

"Flüency and fervour mark its style."

—Jnanendra Lal Roy M.A. B.L.—1905."

"The style in which you have written the book is very good."

—Gopal Chandra Ganguli M. A.
Professor of English, Cuttack College.—7th July, 1905.

"—Bears evident marks of erudition and research."

—Nilmani Ganguli B. A. Head Master,
Nazira H. E. School—1905.

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

"সংস্কৃত কাব্য, নাটক, যোগ ও ভক্তি-শাস্ত্রের বহু সুন্দর সুন্দর শ্লোক সরল সরস বঙ্গানুবাদ সমেত এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথমে উপনিষদাদি হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহার পরে কাব্য, নাটক ও যোগশাস্ত্র হইতে কতকগুলি বাছা বাছা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; সর্ব্বশেষে মধুর ভাগবতের সমধুর শ্লোকনিচয়। সংস্কৃত ভাষাই জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা, ইহাই সপ্রমাণ করা এবং এই ভাষার প্রতি একরূপ বীতশ্রদ্ধ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের মনে এই ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জাগাইয়া দেওয়াই গ্রন্থকারের

উদ্দেশ্য। * * * * তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। * * * * ভাষায় লালিত্য আছে।"

—বঙ্গবাসী ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩১৬ সাল।

"গ্রন্থকার জাতীয় ভাষার অনুশীলন দ্বারা জাতীয় গৌরব সাধনে উদ্যত, তাঁহার সে উদ্যম সফল হইয়াছে। তিনি বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যে সকল মহার্হ উপদেশ সঙ্কলন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের চরিত্র গঠনের সবিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। যে ধর্ম্মশূন্য শিক্ষার প্রভাবে দেশে দারুণ অনর্থ-পাত আরম্ভ হইয়াছে, গ্রন্থকার সেই কুশিক্ষার কুহেলিকা ভেদ করিবার জন্য প্রথমেই ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক কয়েকটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপরে ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবানের স্তব স্তুতির অবতারণা। তাহার পর পিতৃমাতৃভক্তিপ্রসঙ্গ। প্রসঙ্গাধীন নারীজাতির মহিমা-কীর্ত্তন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও চরিত্রবল এবং ধার্ম্মিকতার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। এ গ্রন্থের কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টি উদ্ধৃত করিব? সবই যে শুনিবার ও শুনাইবার মত জিনিষ। যেরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, গ্রন্থকার তাহার সুষ্ঠু পরিচয়দানে সমর্থ। তিনি গীতবাদ্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র সকল দিক দিয়াই সাহিত্যের গৌরব রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি কালিদাসের ভাষায় পিতৃস্নেহের যে অনাবিল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বাৎসল্যরসে হৃদয় আর্দ্র হইয়া থাকে। শকুন্তলাকে দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে নারী চরিত্রের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক শিক্ষণীয়। সতীধর্ম্ম, বীরধর্ম্ম প্রভৃতির সাহিত্যিক অনুশীলন বড়ই পরিপাটী বোধ হইল। উদ্দিষ্ট বিষয়ের পুষ্টিসাধন কল্পে গ্রন্থকার ঋষিযুগ হইতে জয়দেবের সময় পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বজনাদৃত সকল সংস্কৃত গ্রন্থেরই অল্পাধিক আলোচনা

করিয়াছেন। স্থানাভাবে আমরা ইহার সম্যক্ পরিচয় দিতে অক্ষম। এই পুস্তক উচ্চশ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীবৃন্দের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইলে সুশিক্ষার যে সবিশেষ সাহায্য হইবে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।"

—পল্লীবাসী, ২০শে মাঘ, ১৩১৬ সাল।

"গ্রন্থখানি সঙ্কলনের উদ্দেশ্য ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগ উদ্রিক্ত করিয়া দেওয়া। উদ্দেশ্য সাধু ও সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই; কারণ গ্রন্থখানি সরস হইয়াছে।"

—ভারতী, পৌষ, ১৩১৬ সাল।"

"ছাত্রগণের জন্য লিখিত। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধও এ পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।"

—নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

"It is an eloquent appeal. The language is flowing and touches the heart. It shows a genuine love of the Sanskrit literature. The extracts form a charming collection of passages of exquisite beauty. I have no doubt they will be appreciated by those for whom they are meant."

—Jnanendra Lal Roy M. A. B. L. Editor, 'নবপ্রভা'।

"পুস্তকপাঠে সংস্কৃত ভাষা ও আমাদের মাতৃভাষার প্রতি আপনার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছি। দেশ মধ্যে ঐ দুই ভাষার আদর যাহাতে বৃদ্ধি হয় সর্ব্বতোভাবে তাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ দুই ভাষার প্রতি আদর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং আপনার রচিত গ্রন্থগুলি এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ও উপযোগী সন্দেহ নাই। আপনি লিখিয়াছেন—"আমরা ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় ভাষায় যে কিছু জ্ঞানলাভ করিব, তাহা যেন মাতৃসেবায় অর্থাৎ সংস্কৃত,

বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্বজাতীয় ভাষার বিকাশ ও পরিপোষণার্থ নিয়োজিত করিতে পারি।” আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করি। যিনি বিদেশীয় ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া তাঁহার জ্ঞান মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত না করেন, আর যিনি বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়া উপার্জ্জিত ধনের দ্বারা নিজের আত্মীয় স্বজনের এবং নিজের গ্রামের ও দেশের কোন উপকার সাধন না করেন এই দুই শ্রেণীর লোকই দেশের পক্ষে এক প্রকার নষ্ট বলিয়া আমি চিরদিনই মনে করি।”

—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল, বরাহনগর

STRAY NOTES ON THE STUDY OF ENGLISH.

"Bisweswar Babu's "Stray Notes" on the Study of English is an excellent compendium of every-day blunders made by School-boys. The booklet will do much good to those for whom it is intended."

—Mohinimohan Dutt, M. A. Head Master,
Krishnagar Collegiate School. 17/2/10.

"The book contains many things which are useful to the boys as well as to the teachers. It is a good manual and as its price is small, it is within the reach of almost every one"

—Ramdas Bhattacharjya M. A. Assistant Head Master,
Krishnagar Collegiate School—1910.

"The compilation is a very useful one, as it will enable the average boys of our Schools to correct the very common errors in English which most of

them are often liable to. It comprises many useful hints in a small compass. I shall introduce it into my School"

—Ambikadas Ghosh M.A. Head Master,
A. V. School, Krishnagar. March 6, 1910.

"I have gone through the booklet and I find it well suited to the Matriculation Candidates in preparing their lessons on English Grammar and Composition on the eve of their Examination. I have already recommended it to my pupils."

—Nritya Gopal Goswami B.A. Head Master,
P. C. Institution, Gouripur 1910.

"I have introduced your brochure into the first three classes of the school."

—Lal Mohan Goswami, Head Master,
Pakur Raj H E. School—1911.

[N. B.—Book No. 1. may be had of the Author, Santipur P. O. Dist. Nadia.

Book No. 2. may be had at the Siddheswar Press Depository, 66 College Street, Caleutta.

Book No. 3 may be had of Messrs. Chuckravertty, Chatterjee & Co., 15, College Square, Calcutta.

Book No. 4 may be had at the 'Hitabadi Office' 70, Colootola Street, Calcutta or Gurudas Chatterjee's Bengal Medical Library, 201, Cornwallis Street, Calcutta.]